শারদীয়া

জাগরী

কে, সি, দাশের 'রসগোল্লা'

প্রিয়জনের প্রীতভোজে উপাদেয় উপাদান

বায়ুশূন্য টিনেও পাওয়া যায় এবং বহুদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে বলিয়া দূরদূরান্তে উপহার স্বরূপ পাঠানো যায়।

কে, সি, দাশ প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা

আবিষ্কারক—রসোমালাই

অপূর্ব সৃষ্টি...

শুধুই কি তাজমহল?

না! এযুগে তারক গুপ্তের জর্দাও...

মনোরম সৌরভযুক্ত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রস্তুত...

তারক গুপ্তের জর্দা কলিকাতা-৪

P 29598

বনবাদাড় খালখন্দ পেরিয়ে পালকি চলে।

বৌয়ের মন চলে তারও আগে। সোঁদামাটি আর

শিউলি ফুলের গন্ধে মন আনচান। বাপের বাড়ীর দেশ আর কতদূরে?

উত্তর যাত্রায় দুরন্তের বার্তা সহজ হোক।

পূর্ব রেলওয়ে

উড়িষ্যার লোকশিল্পের নিদর্শনে।

সম্পাদক—শ্রীঅপূর্বকুমার সাহা

সম্পাদক কর্তৃক জ্যোতি প্রেস, ১১৫, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ৯এ, হরলাল মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

দেশ বিদেশের খবরের জন্য

১। **উঈকলী ওয়েষ্টবেঙ্গল**—পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ও বিশ্বের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদপত্র। বার্ষিক ৮৲টাকা; ষাণ্মাসিক ৩৲টাকা।

২। **কথাবার্তা**—সমসাময়িক ঘটনাবলী এবং সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কিত বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ১·৫০ টাকা।

৩। **বসুন্ধরা**—গ্রামীণ অর্থনীতি সম্বন্ধীয় বাংলা মাসিক পত্র। বার্ষিক ২৲ টাকা।

৪। **শ্রমিক বার্তা**—শ্রমিক কল্যাণ সংক্রান্ত বাংলা-হিন্দি পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ১·৫০ টাকা।

৫। **পশ্চিম বংগাল**—নেপালী ভাষায় সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ১·৫০ টাকা।

৬। **মগরেবী বংগাল**—সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সচিত্র উর্দ্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ১·৫০ টাকা।

বিঃ দ্রঃ—(ক) চাঁদা অগ্রিম দেয়;
(খ) সবগুলিতেই বিজ্ঞাপন নেওয়া হয়;
(গ) বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেণ্ট চাই;
(ঘ) ভি. পি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক

রাইটার্স বিল্‌ডিংস্, কলিকাতা

এই ঠিকানায় প্রচার অধিকর্তার নিকট লিখুন।

বিজ্ঞাপন দিতে হলে প্রথমেই 'জাগরী'র কথা বলুন।

ভাল লেখা, সুন্দর ছাপা সার্থক হয়, যদি নিখুঁত বাঁধাই হয় বই।

বাজারে নির্ভরযোগ্য বন্ধনী-কেন্দ্র ঃ

প্রভা বাইণ্ডার্স

৯, পটুয়া বাগান, কলিকাতা-৯

"……অতিমানব শিল্পী হবে না শুধু মানুষী প্রকৃতিরই একটা ক্রমপ্রগতি, তার হবে বৃত্তিসমূহের বর্দ্ধিষ্ণু উন্নতি, হবে সমস্ত প্রকৃতিরই একটা রূপান্তর, সত্তায় আমূল পরিবর্তন, এই মানুষকে ছাড়িয়ে মানুষের ঊর্দ্ধে জীবনের অভিনব উত্তরণ……" —শ্রীমা

বোধোদয়

[আভিজাত অধ্যাপনা কেন্দ্র]

স্কুল ফাইনাল থেকে এম্-এ পর্য্যন্ত সাহিত্য, বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য।

• শিশুদের জন্য কিণ্ডারগার্ডেন পদ্ধতিতে বিশেষ ব্যবস্থা •

২সি, কালাচাঁদ সন্যাল লেন, কলিকাতা-৪

ভুলে যাওয়ার মত বই নয়—

'ভ্রমরে'র—'ভুল হলো মধুময়' (১·৫০)

দেশ, আনন্দবাজার, যুগান্তর, লোক-সেবক কর্তৃক প্রশংসিত উপন্যাস।

সুদীন চট্টোপাধ্যায়ের—'না-বলা কথাটি' (৩·০০)

॥ সাকসেস্ পাবলিশিং হাউস্ ॥

১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

পণ্যের প্রচারের বলিষ্ঠ মাধ্যম 'জাগরী'।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গদাধর বিশ্বাস (বিশ্বাস এণ্ড কোঃ কালিদোম ষ্ট্রীট, কলিকাতা:-৯), মানব চট্টোপাধ্যায়, 'দেশ' পত্রিকা, 'যুগান্তর', 'যুগবাণী' পত্রিকার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

প্রাপ্তি স্বীকার

শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মেঘদূত' এবং শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমৃণাল হালদার সম্পাদিত 'সঙ্কিতা' কবিতা-সংকলন পেয়েছি।

—সঃ 'জাগরী'

মিষ্টি কথা আরও মিষ্টি হয়ে উঠবে আমাদের বিশুদ্ধ
রসসমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকার মিষ্টান্ন পরিবেশনে।

গোপালচন্দ্র ঘোষ এণ্ড ব্রাদার্স ও
সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ

২২।২এ, এবং ৩৮।৪এ, বাগবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৩।

"স্বার্থপরতা অন্যত্রাত্মাকে হত্যা করে। কিন্তু সাবধান, পরার্থপরতা যেন অপরের অন্তরাত্মা হত্যা না করে।" —শ্রীঅরবিন্দ।

সৌজন্যতায় ঃ

The Asia Electric Lamp Co.
(Private) Ltd.

45, DURGA CHARAN MUKHERJEE STREET,
CALCUTTA-3.

শারদীয়া অভিনন্দন জানাই—
বর্ত্তমান যুগের খ্যাতনামা
স্বর্ণ-শিল্পী ও মণিকার

আর, জি, রায় এণ্ড কোং
১৮৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বিজ্ঞাপন দিতে হলেই 'জাগরী'র কথা ভাবুন।

For Better Sanitation

ALWAYS CONSULT :

Biren Bose & Co. (Private) Ltd.

[Phone : 46-1481]

P-24, GARIAHAT ROAD,
CALCUTTA-29.

"Look life in the face from the soul's inner strength and become master of circumstances."

—Sri Aurobindo

SPACE DONATED BY :

M/s. SREE NATH MILLS.

Manufacturer of Quality Cotton Fabrics.

Factory :

10, CHITPORE BRIDGE APPROACH,
CALCUTTA-3.

• যে বই প্রকাশিত হয়েছে •

সাগর পানে ফিরি

☆

তারার আলো

শান্তি জুয়েলারী

ঃ হ্যালো, শান্তি জুয়েলারী 34-3013

ঃ হ্যাঁ, শান্তি — ৯৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

বাজারের নির্ভরযোগ্য স্বর্ণ-শিল্পী ও মণিকার।

বিশুদ্ধ সোনা ও আধুনিকতম ডিজাইনের
অলঙ্কারের জন্য

জুয়েল হাউস

পরেশনাথ দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ

৯৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

Phone : 34-3629

শাখা ঃ

১২৮, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯

বিজ্ঞাপনের বিশিষ্ট মাধ্যম 'জাগরী'।

সকালের প্রার্থনা

"ভগবান, আমার বিশ্বাসকে করো হিমালয় সম স্থির। ভক্তিকে করো সকালের শিশিরের মত নম্র ও পবিত্র, নিষ্ঠাকে তৃণের মত বিস্তৃত, ভালবাসাকে করো আকাশের মত নীল ও বিরাট, সংযমকে করো বটবৃক্ষের মত শক্ত শাশ্বত। নিত্য অভ্যাসকে করো প্রভাতে পাখীর গুঞ্জরণের মত কর্মমুখর, সাংসারিক কর্মকে করো প্রশান্ত সবুজ প্রকৃতির মত, অবসরকে করো ফুলে ফলে শোভিত বাগানের মত পূর্ণ। যৌবনকে করো কর্মময়, পৌঢ়ত্বকে করো চিন্তাশীল, বার্দ্ধক্যকে করো ধ্যানময়, মৃত্যুকে করো বন্ধু—যোগময় পরিণতিতে।"

—জ্ঞানচাঁদ।

সৌজন্যতায় :

উদয়ন : **UDYAN** : উদয়ন

4, MANIKTALA BAZAR LANE,
CALCUTTA-6.

14 years old centre for spiritualism, philosophy & pychology.

Any one facing with any problem can consult with Jnanchad on Monday at 7 to 8 P. M. Thursday at 5 to 8 P. M. Sunday at 8-30 to 11 A. M. or write to letters find out proper solution.

বাংলা সাহিত্যে দুটি বিচিত্র সংযোজনা :

'সাগর পানে ফিরি' ও 'তারার আলো'

অনির্বাণ, নিশিকান্ত, দিলীপকুমার রায়, দিবাকর সেন রায়, অমলেশ ভট্টাচার্য, প্রাবসি মুখোপাধ্যায়, ভ্রমর' প্রমুখ ১৬ জন কবির প্রতিনিধিমূলক উৎকৃষ্ট কবিতা সংকলন।

মূল্য—২·৫০ টাকা।

দিনেশ দাস, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, হরপ্রসাদ মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন বসু, কৃষ্ণ ধর, পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সুনীল চন্দ্র সরকার, অনির্বাণ, নিশিকান্ত, দিলীপকুমার রায়, ভ্রমর', কৃষ্ণা ঘোষ, অনামিকা ভট্টাচার্য, অমলেশ ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ ৭৬ জন কবির বৈচিত্রপূর্ণ কবিতা সংকলন।

মূল্য—তিন টাকা

জাগরী প্রকাশনী : কলিকাতা-৩

'জাগরী'তে বিজ্ঞাপন দিলে এক সঙ্গে স্বার্থ ও পরমার্থ।

শুভ জন্মদিন

দুর্গোৎসব : শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ

ক্ষেপ : ইন্দ্রদুগার

টলষ্টয়ের আঁকা ছবি।

স্কেস্ঃ
রাখাল রায়চৌধুরী

'পড়িতে নিরত কাব্যকাহিনী' : দেবাশিস বাগচী

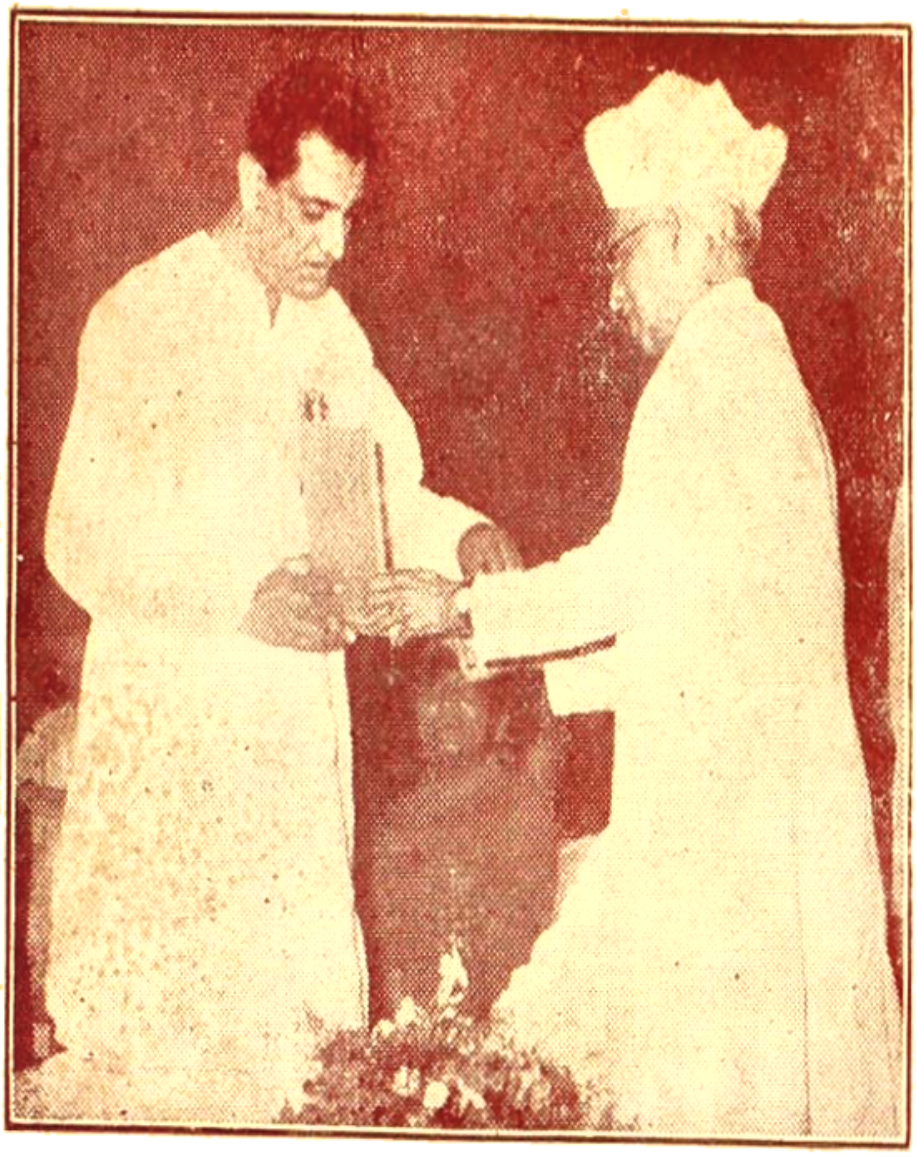

উপরাষ্ট্রপতি সত্যজিৎ রায়কে পুরস্কৃত করছেন।

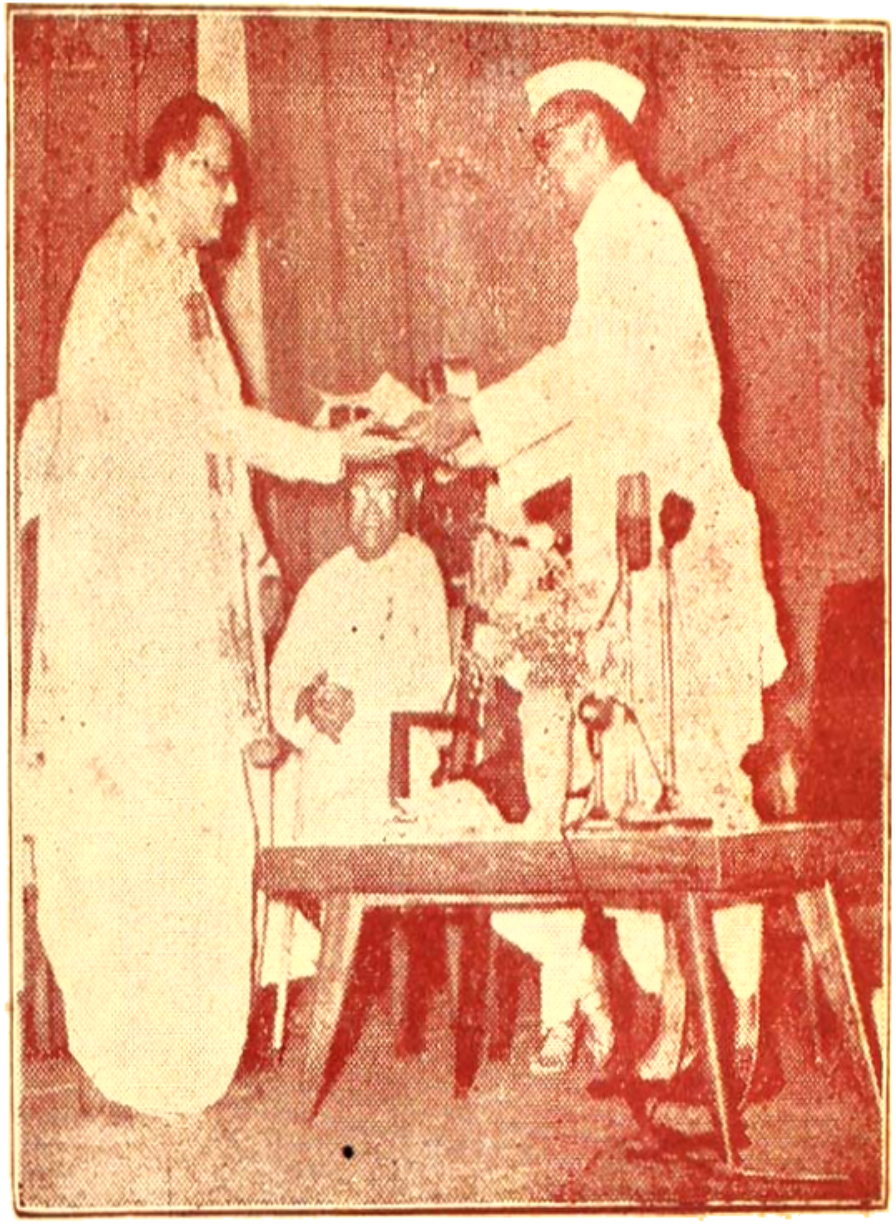

প্রখ্যাত নট ছবি বিশ্বাসকে রাষ্ট্রপতি সম্মানিত করছেন।

সূচীপত্র

শ্রীঅরবিন্দের দুর্গাস্তোত্র অবলম্বনে কবিতা ২৯৯

কবিতায় ৩০০ হইতে ৩০৭

সত্যেন্দ্রনাথ (মাঙ্গলিক), হাফিজের একটি রুবাই

নিশিকান্ত (জাগরণ), অনির্বাণ (নাসদীয়), প্রেমেন্দ্র মিত্র (আয়না)

হরপ্রসাদ মিত্র (বাগানে), গোপাল ভৌমিক (বৃহন্নলা ও গাণ্ডীবী)

শ্রীরবি গুপ্ত (গান), শ্রীঅমূল্য গংগোপাধ্যায় (মন্দভাগ্য)

অমলেশ ভট্টাচার্য (ওঙ্কার) গোপালচন্দ্র ঘোষ (সমুদ্রের মন)

হরিসখা মুখোটী (আমার কবিতা), শৈলেন্দ্রনাথ বসু (কোন এক হীরে মন)

পত্র-সাহিত্যে ও নিবন্ধে

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (একটি চিঠি) ৩০৮

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ (সঙ্গীতে স্বর ও সুর) ৩১৩

পরিমল গোস্বামী (বই যদি আর ছাপা না হয়) ৩১১

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত (শেক্সপীয়রিয়ানা) ৩১৫

পশুপতি ভট্টাচার্য (সাহিত্যের তর্ক), ৩১৩ অভিমন্যু (মঞ্চ চিত্র কথা) ৪০২

সরলকুমার ঘোষ (যন্ত্রণার কবি সুধীন্দ্রনাথ) ৩৮৮

দেবাশিস বাগচী (নায়ন্ আত্মা বলহীনের লভ্য) ৪০১

রম্য-রচনায়, নাটকে ও গল্পে

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (অমিত্রের যুগ) ৩২১

দেবজ্যোতি বর্ম্মণ (অভিশপ্ত গৃহ) ৩৮২

ভ্রমর (কুরুক্ষেত্র) ৩২৯, সুধীরকুমার মল্লিক (ভ্রান্তি) ৩৯২

স্বাগ্নিক (অস্ফুট সংলাপ) ৩৯০, শংকু লাহিড়ী (পূর্ণাহুতি) ৩৯৭

যুব-সম্মেলন, জাগরী-লেখক-চক্র, নারী-তীর্থ ৪০৪

সবুজ-তীর্থ ৪০৫

মৌমাছি (ছড়া) স্বপনবুড়ো (স্বাধীনতা দিবসে)

তরুণ দত্ত, অপূর্ব্ব চট্টোপাধ্যায়, শিপ্রা ঘোষ, হরিপ্রসাদ মেদ্দা

প্রচ্ছদলিপি ও অঙ্গসজ্জা—দিবাকর সেনরায়। দুর্গার মুখ—কার্তিক দাস।

সম্পাদক—শ্রীঅপূর্বকুমার সাহা

'জাগরী প্রকাশনী'র পরবর্তী উদ্যম ঃ

ছিন্নরাখী

অভিশপ্ত দেশভাগের পটভূমিকায় লেখা গল্প-সংকলন। প্রখ্যাত ও অখ্যাতদের মরমী মনের পরম সৃষ্টি বাস্তবে রূপ পাবে 'ছিন্নরাখী'তে। সবার সহযোগিতা কাম্য। জবাবি কার্ডে লিখুন।

নবজীবনের চিন্তা

দিব্যযুগের আগমনী 'জাগরী'র গৌরবময় কর্ম, তাঁর স্বরলিপি সাধন এ প্রবন্ধ গ্রন্থে সংযোজিত হবে। রাষ্ট্রে, সমাজে, শিক্ষায়, শিল্প-সাহিত্যে, ধর্মে যে প্রবুদ্ধ আদর্শ প্রচলিত হবে তারই ইঙ্গিত বহন করবে 'নব জীবনের চিন্তা'।

কুরুক্ষেত্র

বহুঘোষিত এই নাটকটি আগামী মহাকালী পূজার দিন প্রকাশিত হবে সঙ্ঘসমিতি, নাট্যসমিতি সব প্রতিষ্ঠানের সভ্য ও ব্যক্তি বিশেষকে এই সামাজিক নাটক পড়তে, সংগ্রহ করে রাখতে অনুরোধ করি। মূল্য ১·২৫ টাকা।

জাগরী সম্পর্কে

• 'শিল্প দিব্যজীবনের জন্য' এই আদর্শে প্রকাশিত সাহিত্য মাসিক 'জাগরী'। বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা, ষাণ্মাসিক দেড় টাকা। কার্তিক থেকে বর্ষারম্ভ। যে কোন মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

• নূতনদের সমর্থ রচনা গৃহীত হয়।

• জাগরী লেখক-চক্রে যোগদান করতে হলে বা জানবার কিছু থাকলে জবাবি কার্ডে যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়। দেখা করার দরকার হলে সকাল ১১-টার মধ্যে আসা দরকার।

• বিভিন্ন স্থানে 'জাগরী'র জন্য এখনও কিছু Agent দরকার।

J A G A R I

9A, Haralal Mitra Street, Calcutta—3

অতি আধুনিক প্রসাধনী

জাগরী

ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি

৫ম বর্ষ, ১৩৬৭ : আশ্বিন : দ্বাদশ ও শারদীয়া সংখ্যা

সর্ব্বশক্তিদায়িনী মাতঃ তোমার শক্ত্যংশজাত
বঙ্গের যুবক যুবতী মোরা আনন্দ উৎসাহে ভরা
পূজিতে তোমারে তোমার মন্দিরে সমাগত।
বঙ্গ তোমার বিভূতি শক্তিসংহরিতা জননী
আগত দিনে আগত যুগে
ভারতের ভার বহন করে উঠিবে তুমি বিশ্ববিধাত্রী।
জন্মে জন্মে কল্পে কল্পে মানব শরীরে
তোমার কর্ম্মে ব্রতী চির আনন্দ সুধা-নীরে…
নিখিলে প্রকাশ অনন্তাকাশ অসুর দলনী দুর্গতনাশিনি।
বীর মার্গ প্রদর্শিনি, এস চিরকালের তরে
মোদের সবার অন্তরে সবার ঘরে।
বিসর্জন আর হইবে না কিছু…অখিল জীবন
অনবিচ্ছিন্ন দুর্গাপূজা
মাগো, অকপট কর নির্ম্মল কর নিঃশঙ্ক কর
বীর্য্যবান-শক্তিমতী কর দশভূজা।
সন্তান মাঝে চিরসুস্মিতা হয়ে জেগে রও
প্রার্থনা মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও॥

[শ্রীঅরবিন্দের দুর্গাস্তোত্র অবলম্বনে]

মাঙ্গলিক

(অথর্ববেদ)

অনুবাদ : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

এ গৃহে শান্তি করুক বিরাজ মন্ত্র-বচন-বলে,
পরম ঐক্যে থাকুক সকলে, ঘৃণা যাক দূরে চ'লে ;
পুত্রে পিতায়, মাতা দুহিতায় বিরোধ হোক দূর,
পত্নী পতির মধুর মিলন হোক্ আরো সুমধুর ;
ভা'য়ে ভা'য়ে যদি দ্বন্দ্ব থাকে তা' হোক আজি অবসান,
ভগিনী যেন গো ভগিনীর প্রাণে বেদনা না করে দান ;
জনে জনে যেন কর্ম্মে বচনে তোষে সকলের প্রাণ,
নানা যন্ত্রের আওয়াজ মিলিয়া উঠুক একটি গান।

জাগরণ

(গান)

নিশিকান্ত

প্রিয়তম, তুমি জাগালে আমায়
তোমার কঠিন আঘাতে।
তোমার প্রেমের কোমল পরশে
পারোনি আমায় জাগাতে
জাগালে কঠিন আঘাতে।
লভিয়া তোমার দানের কুসুমগুলি
প্রাণ-বল্লরী ছিল যে তোমায় ভুলি ;
সব ভুল ভাঙার কণ্টকমালা
দিলে চেতনার শাখাতে।
জাগালে কঠিন আঘাতে ॥
আমার বিফল পূর্ণিমারাতে
ঘনায়ে আঁধার রাত্রি ;

ঘরভাঙা-ঝড়ে কোরেছ আমায়
তোমার পথের যাত্রী।
মলয়-বাসর-বাঁশরীতে বাজি নাই,
প্রলয়শঙ্খে বাজায়েছ মোরে তাই ;
প্রভঞ্জনের প্রগতি দিয়েছ
জীবন-পাখির পাখাতে।
জাগালে কঠিন আঘাতে॥

হাফিজের একটি রুবাই *

ওরে দিল্, দিল্ তোর ফিরিয়ে নে দুনিয়া-মায়ের কাছ থেকে—
তার খসমের যে শেষ অর্ধেক তারি সঙ্গে এক হয়ে যা। দিল্, তুই যদি প্রিয়ের সৌরভে হাফিজের মতো আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে যাস,
তা হলে হাফিজের মতোই তুই হবি হুঁসিয়ার সমঝদার।

নাসদীয়

অনির্বাণ

শূন্যমনা—
মৃত্তিকার স্তূপ।
পক্ষাঘাতে অসাড় পৃথিবী,
বিশোকার জ্যোতিঃশিখা ধূমোদ্গারী অমা-আচ্ছাদনে :
সরস্বতী-কল্পধারা লুপ্ত বিনশনে।

নীলকণ্ঠ তবু অচঞ্চল :
অক্ষমালা চলে আবর্তিয়া নির্ঘটন কালের কলনে,
রুদ্ধশ্বাস জপে কোন্ শূন্যের অজপা।

---

* শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত তাঁর এক পারস্য ভাষা ও সাহিত্য-বিশারদ পণ্ডিত বন্ধুর সাহায্যে অনুবাদ করেছেন।

ষোড়শীর সহস্রার কমল-আসন
ঢলিয়া পড়েছে ঘুমে বাঞ্ছনীর তুহিন-ছোঁয়ায়।
শুধু ঊর্ধ্ব-নীলে
অনামিকা সপ্তদশী কলা
নৈঃশব্দ্যের কুহরে সঞ্চারে
কৃষ্ণরশ্মি ঋণাঙ্কিত তাপ।

চেতনার নিবাত শিখরে
রচিয়াছি মৃত্যুহিম সুপ্তির বাসর—
রুদ্ধশ্বাসে নিয়েছি শুষিয়া
সপ্তদশী-অধরের সুধা-হলাহল।
নীল কণ্ঠ—তবু মরি নাই।
নির্ঘটনা কালের কলনা
জড়াণুর অকেতন নাড়ীর স্পন্দনে…
কল্প আর ক্ষণে সেথা ঘুচেছে প্রভেদ।
তবু তার বক্ষে অমরণ যে নিষ্কল তেজোবিচ্ছুরণ,
সৃষ্টির সুরন্ত ভ্রূণ
কে জানে রচিছে কি না
তারই মাঝে অমাস্তের স্বপ্নের দেয়ালি।

কুহুর কুহেলি আজি
বক্ষে বাঁধি শুষ্ক দৃষ্টিহারা—
সুদূরের সঙ্কর্ষণে রচি স্বপ্নে রাকার ক্ষণিকা।
ষোড়শী পূর্ণতা তার
কে জানে ফোটাবে কি না
শতচ্ছন্দা দ্যুলোকের অকল্প রূপালি॥

আয়না

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সোনার কাঠি চাইনা যাতে
মরারা হবে জ্যান্ত,
আকাশে চাঁদ ধরার নেই বায়না,
বাঁচার মানে বুঝব যাতে
শুধুই সেই ধ্যান ত,
নিজের মুখ দেখার চাই আয়না।

বাগানে

হরপ্রসাদ মিত্র

কতো মন দেখে, আর, কতো মন দেখেও দেখে না
সে দুঃখ নিশ্চয় তীক্ষ্ণ কাঁটা হয়ে বেঁধে না হৃদয়ে ?
ফুলকে বললুম , সেই মেটে-পাপ নির্গন্ধ জিনিয়া
হাওয়ায় দুললো মাত্র, কিন্তু সে কি আমারই কথাতে ?
কবিরা সাজিয়ে বলে, নাটকেও বানানো কতো কী।
বড়োই মসৃণ কথা শোনা যায় গল্পের সংলাপে।
জীবনে সৌষম্য তবু আজো নয় স্বতই স্ফুরিত—
ফুলকে বললুম ; তাতে নিরুত্তর সজ্জিত জিনিয়া।
ফুলেরা মাটির শিশু। সব শিশু সমান দুর্গম,
সমস্ত দুরূহ এই জগতের অর্থের সন্ধানে।
কতো মন দেখে, আর, কতো মন দেখেও দেখে না
বোধের পরম ক্ষণে জেগে উঠি সহজ বাগানে।

'তারার আলো' থেকে

বৃহন্নলা ও গাণ্ডীবী

গোপাল ভৌমিক

অর্জুন গাণ্ডীবী ছিল
* বৃহন্নলা কে সাজালো তাকে ?
যারা ছিল নিশাচর
দিবালোকে তারা চলে ঝাঁকে।
আর দিবালোকবাসী
আঁধারে লুকাতে চায় মুখ ;
দিনরাত থাকে থাক
খুসি না রইলে তাকতুক।
অথচ সে আশা বৃথা,
মারণ ও উচাটন এসে
যা-কিছু সৎকে বাঁধে
অসৎকে চলে ভালবেসে।
তাই ভাবি বৃহন্নলা
যদি ফের না হয় গাণ্ডীবী
ভীমরতি কে সারাবে ?
কে সরাবে এই উই ঢিবি ?

* (বিরাট রাজার গৃহে নপুংসকবেশী অর্জুনের ছদ্মনাম।)

কোন এক হীরে মন

শৈলেন্দ্রনাথ বসু

সন্ধ্যার জানলায় যে শহরটা চোখে পড়ে—
নিঃশব্দ শিশিরে হরফ সাজায় নগ্ন উত্তেজনার যুবক
রক্তের হাওয়া ভরে নীল ফুটো ফুসফুসে,
আর সান্ত্বনার ওজন নিয়ে বলে, তাকে আমি পাবই !

কিন্তু আমি জানি হীরেমন কথা ছোড়ে নদীর বোয়াকে
তাই আমার টুকরো মনকে করো মাঠ।
থাক না তোমার নির্দেশ দুরেকটা তালগাছ হয়ে
অজস্র চুমকি কথার চোয়ালে যন্ত্রণায় কোন পাহাড়
কোনদিন যদি পূর্ণিমা নামে,
আর হাওয়া কর্পূরের গন্ধে বলে—
সেই যে মানুষটা বুক চেপে হাপিত্যেশ টলত
'রে পিয়ারী, তুই মদ না, আঙুর না, গানও হতে পারলি নে,
নিয়মের মক্কে তলানো গ্লানি—জীবন একটা ফুটো-
পকেট বই তো নয়!
ঘন অন্ধকার বৃষ্টিও তাকে ভেজাতে পারলে না।
তবু দেখো ব্যক্তিত্বের চৌকাঠ পেরিয়ে আমার মৃত ইতিহাস,
শ্যামবাজার মোড়ে ধবেল ফুল কিনে জড়াল, পায়ে পায়ে এল,
সবুজ মোমবাতির মেঘ সরিয়ে অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতিতে
শোনাল সেই প্রিয় নামটা—
একটা মায়াহরিণ ছুটে যায় শব্দের নদীতে
তুমি আমার দিকে চাইলে—কিন্তু আমি তখন কোথায়!

মন্দভাগ্য

(শ্রীঅরবিন্দের Ill luck)

[অনুবাদক : অমূল্য গঙ্গোপাধ্যায়]

আগুনঝরা নিদাঘে বুঝি বিকট সে একজন,
অসহ তার হল যখন তপ্ত রবিকর,
একটু শীতল হবার লাগি লভি ছায়ার কোলে
নিয়তি তায় দেখাল পথ তমাল তরুর তলে।
দাঁড়াল যেই পথিক সেথায় পড়ল মাথে ফল
শোণিত ধারায় মিলল যে তার ব্যথার আঁখিজল।
যেখানেই যাক্ না যে জন ভাগ্যহীন যে হয়
হতাশা আর বেদনা দুই তাহার পিছু লয়॥

গান

শ্রীরবি গুপ্ত

(পণ্ডিচেরী আশ্রম)

কে তুমি করুণা ধরিয়া মুরতি এসেছে অবনীতলে,
আগমনে তব কত যুগান্ত-যামিনী-গহন জলে।
পরশে তোমার আজি ধরণীর ধূলি
উঠিছে দীপ্ত-পাবক-শিখায় দুলি',
সুচির কালের স্বর্ণ-স্বপন লভিল মুরতি পলে,
কে তুমি করুণা ধরিয়া মুরতি এসেছে অবনীতলে।
কে তুমি মহিমা মলিন ধরায় এসেছ নামিয়া আজি,
দিকে দিকে ওই বিজয়-শঙ্খ তোমার উঠিছে বাজি'।
সকল স্বর্গ চরণে তোমার রাজে
বিরচ অমরা মানবেরি হিয়া-মাঝে
ম্লান-মেদিনীর আলো যে মূর্ত বিমল বহ্নিদলে,
কে তুমি করুণা ধরিয়া মুরতি এসেছ অবনীতলে।

আমার কবিতা

হরিসখা মুখোটী

মুখোমুখি বসে আছি দুইজন আমি আর অন্ধকার,
নিষ্প্রভ আকাশ-তলে বিক্ষুব্ধ জীবন-পাথার।
কাল-স্রোতে তৃণসম বহুকাল হলো অপচয়,
খুঁজে খুঁজে তারপর পেলাম এক দ্বীপের আশ্রয়—
এ দ্বীপ নিরাশার, মুখে তার আঁকা ধূসরতা ;
এখানে সূর্য্য নেই, সবুজের স্পর্শ-কাতরতা
কঠিন পাথর-বুকে ঘুমে আজো বেঁধে আছে দানা।
এ দেশ রহস্য-লোকে থেকে গেল, সবার অজানা।
এ দ্বীপ ভূগোল হীন, দুর্বোধ্য তাহার ভণিতা ;
চির- অন্ধকার এই দ্বীপ বুঝি আমার কবিতা।

ওঙ্কার

অমলেশ ভট্টাচার্য

কায়কল্প ঋতু আর লবনাক্ত শোণিতের স্রোতে
অযুত যোনিচক্রস্মৃতি—।
রতিক্লান্ত সৃষ্টির সংরাগে
দেহমন আতুর উদাসী।
দোদুল্য প্রতিবিম্ব নিয়ে
জলের রেখায় শব্দের স্বরবৃত্ত এঁকে
আমাকে বাঁধিয়া রাখে
মৃত্যুর হিমস্রব ওষ্ঠের সমীপে।
সায়াহ্নের তটে প্রত্যহের শবদেহ দাহ করি আমি,
নৈঃশব্দ্যের অতলে স্নান করি :
শান্তির স্বস্তির লিপি
আকাশের বাগীশ্বরী নক্ষত্র সভায়
আগামী দিনের আতিথ্যে কম্পমান।
সপ্ততন্ত্রী আকাশের স্বরে
শিরাগুলি টান্ টান্ বাঁধা—
আশাবরী রাগের মূর্চ্ছনা…
অন্তরায় ছায়ানট কাঁপে…
মৃগ তৃষিকার স্বপ্ন ছেড়ে
স্নায়ুজাল কর্কশ ক্রন্দনে কেঁদে ওঠে।
শচীমাতার মর্মের বাঁধন খুলে
শরীরের সপ্তশিরা উচ্চনাদ আলোর ওঙ্কার—
তণু মনে সোমদেব অগ্নিরস ঢালে—
মুহূর্তের চূর্ণ অগ্নিকণা
নিঃস্ব হ'য়ে বিশ্ব পায়
গোত্রহীন নভেঃ
টঙ্কারে ওঙ্কারে।

সমুদ্রের মন

গোপালচন্দ্র ঘোষ

বৃষ্টির ফোঁটার গুড়ো হাওয়ায় সোয়ার,
উতলা স্মৃতির রাতে হৃদয়-জোয়ার
কূলে কূলে ভেঙে পড়ে ; ভুলে থাকা নাম
জলের গন্ধের মত ছড়ায় আরাম।

আলোর চুড়ীতে কিছু নীলের ঝিলিক,—
কে হাত বাড়িয়ে দেয় খোঁজে চারিদিক,
মাটি ভেজে ঘাস জাগে পাতা সাজে গোজে—
হৃদয় জাগ্রত হয়ে সে উন্মেষ বোঝে।

অদৃশ্য বাষ্পেরা যেথা ঘনীভূত হয়—
দূর শূন্য অন্ধকারে স্মৃতির সঞ্চয়
সঙ্গীতের মত সুরে সাকার শান্তিতে
মাটিতে মনেতে নামে পান্নার কান্তিতে।

এ ঘর অনেক ছোট নির্জন কোণ,
বাহিরে ঘনিয়ে আসে সমুদ্রের মন ;
পরিচয় বয়ে আনে জলের বাতাস,—
সব জ্বালা মুছে যায় থামে দীর্ঘশ্বাস।

একটি পত্র

৬নং স্যুইট
৬ রাসেল ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-১৫

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত
মহাশয়ের সমীপে

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

"কবির্মনীষী" আমার হাতে পৌঁছেছিল, যে-দিন আমরা লণ্ডন ছাড়ব তার আগের রাত্রে। তাই তখনই আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারিনি, এবং প্রকাশককেও জানাতে পারিনি আমার অসংখ্য ধন্যবাদ। দেশে ফিরে অবধি হাঙ্গামার অন্ত নেই, এবং এখনও স্থির হয়ে বসার অবসর পাচ্ছি না। কিন্তু আমার প্রসঙ্গে গভীর ও দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে আপনি আমাকে যে-অভাবনীয় সম্মান দিয়েছেন, তা বিনাবাক্যে মেনে নিলে, নিজের কাছেই আমার অপরাধ বাড়বে; এবং সেই জন্যে ঋণশোধের সুযোগ না খুঁজে, আজ শুধু ঋণস্বীকারের এই হাত চিঠি পাঠাচ্ছি।

উক্ত প্রবন্ধে প্রশংসার অংশ নিশ্চয়ই আমার প্রাপ্য নয়, কিন্তু বিপরীত সমালোচনার কথা কয়েকটি মূঢ় বলেই, অবশ্য গ্রাহ্য। তবে পূর্ণের উপলব্ধি যে-সাধনার লক্ষ্য, তাতে আমি অধিকারী নই; এবং তাই আমার পক্ষে সত্যরক্ষার একমাত্র উপায় বর্ত্তমান বিভীষিকার অঙ্গীকার। তৎসত্ত্বেও সৌন্দর্য ও শান্তির সন্ধান আমরা পেতে পারি; কিন্তু সেই সঙ্কেতের পথ এই নরকের অন্তঃপাতী; এবং যারা এখানে চিরকাল অবরুদ্ধ থাকতে সম্মত নয়, তারা স্বপ্নান্ধ হলে, সর্বনাশ অনিবার্য। বরঞ্চ তারাই বিশেষ করে মানতে বাধ্য যে তারা যেমন অমঙ্গলের স্রষ্টা, তাদের সঙ্কল্প তেমনই শিবের সিংহাসন; এবং অনুরূপ সোঽহং বাদে আত্মরতির স্থান নেই, আছে কেবল কঠোর আত্ম জিজ্ঞাসা যার নির্বাণ নৈর্ব্যক্তিক শান্তির অগাধ অহংকারে।

বলাই বাহুল্য যে ওই আদর্শ ললিত পদাবলীর অনুকূল নয়; এবং সাম্প্রতিক জগতের বিষয়ে দুরুক্তিই সত্যবাদীর অনন্য সহায়। কিন্তু যদি

সে-রকম ঔচিত্যের বিচারে আজ নাও নামি, তবু এ-কথা বোধহয় তর্কের অবকাশ রাখে না যে শুচিবায়ু তো রোগ বটেই, বাংলা সাহিত্যের পক্ষপাত আবার গদ্য-পদ্যের জাতিভেদ থেকে উৎপন্ন। তার মানে এমন নয় যে কবিতার ছন্দোরক্ষা নিষ্প্রয়োজন, অথবা আধুনিকের গুরুচণ্ডালী ভাষা লেখকমাত্রের অনুকরণীয়। এবং আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে গতানুগতিক বিধিনিষেধের সঙ্গে নিজস্বের সামঞ্জস্যসাধনই কবি প্রতিভার পরম ও চরম কর্তব্য। তবে আমি নিজেও জানি যে প্রতিভা আমার নেই; এবং যিনি "শেকসপীয়রিয়ানা"র জনক, তাঁকে রচনা রীতির বিষয়ে উপদেশ দিতে যাওয়া ধৃষ্টতার পরাকাষ্ঠা।

অতএব চিঠিখানা আজ এখানেই শেষ করছি। আপনি কখনও কলকাতায় এলে, এবং আপনার হাতে সময় থাকলে, যদি আমাকে ডাক দেন, তাহলে সাক্ষাৎ উপস্থিত আলোচনা হয়তো আরও কিছুদূর এগোতে পারে। তবে ইতিমধ্যে এ-টুকু না লিখে ছেদ টানতে পারছিনা যে "কবির্মনীষী" প'ড়ে আমি কেবল আনন্দ পাইনি, উপকৃতও হয়েছি বিশেষ প্রসাদগুণের অন্তরালে রয়েছে যথার্থ অন্তর্দৃষ্টি। প্রকাশকের কাছেও আমি অত্যন্ত অনুগৃহীত : তাঁর প্রেরিত উপহার সাত সমুদ্রের ও-পারে পৌঁছেছিল অসামান্য সৌজন্যের সাক্ষী হিসাবে; এবং শুধু পুনরুক্তির ভয়ে আপনাকে ও তাঁকে এক সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি না, আপনার মতো তিনিও আমার উত্তমর্ণ ব'লেই, এই স্বীকার পত্র আপনার উদ্দেশে পাঠাচ্ছি তাঁর মারফতে।

ইতি ২৯ ডিসেম্বর ১৯৫৯

প্রীতিনমস্কারান্তে
স্বাঃ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

['বর্তিকা'র সৌজন্যে]

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের প্রতি নিবেদন

খুবই আনন্দের কথা, আপনাদের সহযোগিতা ধন্য 'জাগরী' মাসিক পত্র কার্তিক মাস থেকে ৬ষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করছে। যাদের চাঁদার মেয়াদ বর্তমান মাসে শেষ হয়ে গেল তাঁরা সত্বর নূতন বৎসরের চাঁদা পাঠিয়ে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা অব্যাহত রাখুন। বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা, ষাণ্মাসিক দেড় টাকা মাত্র।—কর্মাধ্যক্ষ, 'জাগরী'

বই যদি আর ছাপা না হয়

পরিমল গোস্বামী

কাগজের অভাবে, বইয়ের ব্যবসা যদি নষ্ট হয়, তা হলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল এমন মনে করার কোন কারণ নেই। বই গেলেও বইয়ের লেখক থাকবে এবং প্রকাশক থাকবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা পাঠকও থাকবে।

বই থাকবে না, অথচ এরা থাকবে, কথাটা ধাঁধার মতো শোনালেও এর মধ্যে জটিলতা নেই কিছু। পক্ষান্তরে আমি লেখক, প্রকাশক ও পাঠকদের এমন একটি বিকল্প ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি, যা বর্তমানের চেয়ে বেশি উজ্জ্বল এবং বেশি মনোহর। অবশ্য এ ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে কাগজের দুর্ভিক্ষ কতদিন চলবে তার উপর। যদি দুর্ভিক্ষ দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে আজকের দিনের এই একঘেয়ে লেখক-প্রকাশক-পাঠক সম্পর্কের পরিবর্তে এ-তিনের মধ্যে এক অভিনব নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হবে।

আমি ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি বিশেষ কতকগুলো লক্ষণ থেকে। সকলেই জানেন, আমাদের দেশের পাঠকেরা লেখার চেয়েও লেখককে দেখতে চায় বেশি। সেইজন্যই এদেশে এত সাহিত্য সভা। এবং শুধু সাহিত্য সভা নয়, পুজো-সংস্কৃতি সভাও আমাদের দেশে সংখ্যাতীত। এর প্রত্যেক সভায় কোনো না কোনো সাহিত্যিককে উপস্থিত থাকতেই হয়। অন্যান্য দেশে লেখকেরা এত শস্তা নয়। তাদের বক্তৃতা টিকিট না কিনে শোনা যায় না বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই।

কিন্তু এদেশে তো বক্তৃতা শোনার জন্য লেখককে সভায় টানা হয় না, টানা হয় তাকে দেখার জন্য। পয়সা দিয়ে দেখার মতো লেখক আমাদের দেশে আছে কিনা জানি না, অন্ততঃ দর্শকের এ চেহারা দেখার জন্য পয়সা দিতে রাজি হবে কি না বলা শক্ত। পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

কিন্তু এ আলোচনা থাক। আমি বলছি বই ছাপা যদি বন্ধ হয় তাহলে প্রকাশকেরা পাণ্ডুলিপি সমেত লেখকদেরই পাঠাবে পাঠকদের বাড়ীতে। যে ব্যক্তি যে লেখকের লেখা পড়তে চায়, বাছাই করে তাকে সেখানে পাঠাবে একটা নির্দিষ্ট ফী-এর পরিবর্তে। প্রকাশকের গাড়ি থাকবে সেই গাড়ীতে লেখকেরা বাড়ি বাড়ি যাবে তাদের বই পড়ে শোনাতে। আগে বিজ্ঞাপন দিয়ে সময় ঠিক করে নিতে হবে। উপন্যাস হলে ক্রমশঃ শোনাতে

হবে। যেমন বেলা ৮টা থেকে ১০টা 'ক'য়ের বাড়িতে। ১০টা থেকে ১১টা 'খ'য়ের বাড়িতে। যার সঙ্গে যেমন চুক্তি। একই বাড়িতে রুচিভেদে পৃথক ব্যক্তি পৃথক লেখকের লেখা শুনতে চায়—সেখানে এক সঙ্গে একাধিক লেখক যাবে এবং পৃথক পৃথক ঘরে বসে পৃথক পৃথক রুচিকে তৃপ্ত করবে। শুধু গত বিবাহিত দম্পতির কাছে বিবাহ বিচ্ছেদ সমর্থনে কোন গল্প বা প্রবন্ধ পড়া চলবে না।

প্রকাশকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকলে কোনো লেখকই গোপনে ফী নিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে কাউকে তার লেখা শোনাতে পারবে না। শ্রোতার সংখ্যা হিসাবে ফী কম বা বেশি দিতে হবে। লেখক রয়্যালটি পাবে। কপিরাইট বিক্রি করলে প্রকাশক অন্য লোক ভাড়া ক'রে তাকে দিয়ে কাজ করাবে। যে লেখকের চেহারা খুবই খারাপ অথচ ভাল পড়তে পারে না, সেখানে কপিরাইট বিক্রি করাই সুবিধাজনক। কোনো অবিবাহিত লেখক লেখা শোনাতে শোনাতে কোনো পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ক'রে যদি সে পরিবারের কোনো মেয়েকে বিয়ে করে, এবং সে বিয়ে যদি লাভজনক হয়, তবে পূর্বে লেখাপড়া না থাকলে লাভের শতকরা ১০ অংশ প্রকাশককে দিতে হবে। লেখিকার ক্ষেত্রেও এ রকম ঘটতে পারে। তা যদি হয় এবং কোনো শ্রোতা-বর-পিতাকে যদি লেখিকার পক্ষ থেকে পণ দিতে হয়, তবে এই উপলক্ষে প্রকাশককে লেখিকার নির্ধারিত রয়্যালটি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিতে হবে।

মাসিক পত্রের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হবে আরও সহজ। কেননা সে ক্ষেত্রে প্রকাশকের একখানা খোলা লরি রাখলেই চলবে। প্রতিমাসের লেখক-লেখিকা এই লরিতে চেপে গ্রাহকদের বাড়িতে গিয়ে তাদের লেখা শুনিয়ে দিয়ে আসবে। চিত্রকরও এদের সঙ্গে ছবি নিয়ে যাবে, তবে তার প্রাপ্য হবে নাম মাত্র কেননা ছবি দেখাতে দেরি হয় না। শুধু মাসিকপত্রের পরিবেশ সৃষ্টির জন্যই রচনা পাঠ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের চোখের সামনে ছবি ঝুলিয়ে রাখতে হবে, এবং ততক্ষণ সে পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে নিতে পারবে। তার পরিশ্রম কম, তাই পাওনা কম।

সুতরাং বই বা মাসিকপত্র বন্ধ হলে ভয় পাবার কারণ নেই, অ্যাডাপটেশন টু এনভাইরনমেন্ট বা পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া জীবন মাত্রেরই ধর্ম এবং এবিষয়ে মানুষজীবই সবচেয়ে বেশি পটু, অতএব দুঃখ না করে নতুন অবস্থাকে স্বাগতম্ জানাই। পুনশ্চ নিবেদন: এই পরিকল্পনায় কবিদের স্থান নেই।

সঙ্গীতে স্বর ও সুর

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

স্বর ও সুরের সহযোগিতা নিয়ে সঙ্গীতের সামগ্রিক রূপ গড়ে উঠেছে। সুর বলতে রাগকে বুঝতে হবে, আর স্বর সুর বা রাগের অংশ। স্বরকে একদিক থেকে রাগাংশ বা রাগের অংগ বলা হয়। সুরের বা রাগের যে লালিত্য, লাবণ্য ও সৌন্দর্য—তাকে গড়ে তোলে স্বরেরই লালিত্য ও সৌন্দর্য; কেননা এক একটি স্বরের সমারোহকে নিয়ে যেমন সুর বা কাঠামো গড়ে ওঠে তেমনি তার অন্তরের মাধুর্য ও প্রাণশক্তি গড়ে ওঠে স্বরেরই অন্তর্নিহিত মাধুর্য ও প্রাণস্পন্দন দিয়ে।

আমরা জানি, স্বরের কঙ্কালকে গড়ে তোলে শ্রবণযোগ্য ও শ্রবণাতীত অসংখ্য সূক্ষ্ম স্বর। এই সূক্ষ্ম স্বরগুলি কম্পনের সৃষ্টি। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে শ্রবণযোগ্য সূক্ষ্ম স্বরকে 'শ্রুতি' বলা হয়েছে। এ'রকম শ্রবণযোগ্য স্বর পাঁচটি—নারদ বলছেন তাঁর শিক্ষাশাস্ত্রে, আর নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা ভরত বলেছেন বাইশটি। এই পাঁচ ও বাইশ সংখ্যার মধ্যে একটা গূঢ় রহস্য লুকিয়ে আছে বিশেষভাবে। খৃষ্টশতাব্দীর গোড়ার দিকে যে পাঁচ শ্রুতি ছিল তার লালিত্য ও মাধুর্য নিয়ে সাত স্বরের প্রাণস্বরূপ, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় অব্দে ভরত সে পাঁচটিকে ভিত্তি ক'রে গড়ে তুলেন তাঁর বাইশ শ্রুতি। ফলে দাঁড়ালো একটি কারণ ও অপরটি কার্য। এই কার্য-কারণ সম্বন্ধে নিয়েই কিন্তু সমগ্র বিশ্ব-সংসারও সৃষ্টি হয়েছে। নারদের পাঁচটি শ্রুতির রস ও ভাব ভরতের বাইশটি শ্রুতির লাবণ্য, সৌন্দর্য ও রস-মাধুর্যকে গড়ে তুলেছে। নারদের পাঁচ শ্রুতির নাম: দীপ্তা, আয়তা, করুণা, মৃদু, ও মধ্যা বা মধ্যমা। এই পাঁচটি শ্রুতি বা শ্রুতিস্বরকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—এদের মধ্যে যে' রস ও ভাবের সঞ্চার আছে তারা বৈদিক সামগান ও লৌকিক গান্ধর্ব ও অভিজাত দেশী গানের সাত স্বরে ও বিচিত্র সুরেও লীলায়িত। ভরত নাট্যশাস্ত্রে শৃঙ্গারাদি আট রসের পরিচয় দিয়েছেন। নারদের পাঁচ শ্রুতিতে ঐ আটটি স্বরেরই বিকাশ আছে।

নারদের বাইশ শ্রুতির নাম: তীব্রা, কুমুদ্বতী, মন্দা, ছন্দোবতী, দয়াবতী, রঞ্জনী, রতিকা, রৌদ্রী, ক্রোধা, বজ্রিকা, প্রসারিণী, প্রীতি, মার্জনী, ক্ষিতি, রক্তা,

সন্দিপনী, আলাপনী, মদন্তী, রোহিণী, রম্যা, উগ্রা ও ক্ষোভিণী। তীব্রা থেকে ক্ষোভিণী শ্রুতিগুলি কিন্তু নারদের পাঁচ শ্রুতিরই প্রভাব ও প্রকৃতিকে নিয়ে পরিপুষ্ট হয়েছে। যেমন,—

(১) দীপ্তা—তীব্রা, রৌদ্রী, ক্রোধা, বজ্রিকা, মদন্তী ও উগ্রা।

(২) আয়তা—কুমুদ্বতী, প্রসারিণী, সন্দিপনী, রোহিণী।

(৩) মৃদু—মন্দা, রতিকা, প্রীতি, ক্ষিতি,।

(৪) মধ্যা—ছন্দোবতী, রঞ্জনী, মার্জনী, রক্তা, রম্যা, ক্ষোভিণী।

(৫) করুণা—দয়াবতী, আলাপিনী, মদন্তী।

নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত শৃঙ্গার, রৌদ্র, হাস্য, বীভৎস, বীর, করুণ, জুগুপ্সা ও বিস্ময় আটটি রস নারদের পাঁচ শ্রুতি—যেগুলি পরবর্তীকালে জাতি বা রাগে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং ভরতের বাইশ শ্রুতি—যেগুলি কার্য-রূপে পরিচিত—সবগুলিতেই লীলায়িত দেখা যায়। শ্রুতি ও স্বরের সমাবেশ ও সমাবোহ নিয়েই সুর বা রাগ। রাগে যে রস ও ভাবের সঞ্চার দেখা যায় তারা নারদের পাঁচ শ্রুতির অথবা ভরতের বাইশ শ্রুতির রস ও ভাবেই পরিপুষ্ট। রস ও ভাব আবার সুর বা রাগের প্রাণ। উত্তর-ভারতীয় ও দক্ষিণ-ভারতীয় রাগগুলিতে তাই রস ও ভাবের বিকাশ ও সঞ্চার বুঝতে গেলে আমাদের নারদের পাঁচ শ্রুতি (বা জাতি) এবং ভরতের বাইশ শ্রুতির স্বরূপকে চিনতে হবে। জাতি ও শ্রুতির আসল সার্থকতা তাই। সঙ্গীতে স্বর ও সুরের রহস্য-কথাও তাই।

সঙ্গীতে সুর বা রাগের গঠন শ্রুতিনির্দিষ্ট স্বরস্থানকে (tonal base) নিয়ে রূপায়িত ও লীলায়িত হয়, এজন্য শ্রুতি ও স্বরস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে সুর বা রাগের সম্বন্ধে কোন জ্ঞান লাভ করা করা যায় না। শ্রুতিও স্বর, তবে সূক্ষ্ম স্বর। স্বর ও সুরের মৈত্রী ভাবই মানুষের অন্তরে সাম্যরসের সঞ্চার করে ও তারই জন্য সঙ্গীতের মাধ্যমে মানুষ জরা-মরণশীল সংসারে শাশ্বতী শান্তি ও পরম-সান্ত্বনা পায়।

শেক্সপীয়রিয়ানা

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

সিনেমায় সেদিন দেখলাম 'জুলিয়াস সীজর'—নূতন করে তাই এই শেক্সপীয়র-জিজ্ঞাসা। প্রথমত মনে হল হিংসা অর্থাৎ হিংস্রতা (violence) সুফল কখন আনে না—তার পিছনে সদ্‌বুদ্ধি সদুদ্দেশ্য থাকলেও তা আনে কেবল বিপর্যয় বিশৃঙ্খলা বিনষ্টি। বৃত্তিটি গর্হিত অর্থাৎ অসাধু নীতিবিরুদ্ধ, মানবতার পরিপন্থী বলে যে এরকম ঘটে তা নয়—জড় প্রকৃতিরই একটা নিয়মের, প্রায় অচেতন যান্ত্রিক-নিয়মের ফলে, যাকে বলা হয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়ম। জোর-জবরদস্তি করে যে কাজ কর এবং যতটা জোর-জবরদস্তি করে, ঠিক ততটা জোরে তোমার উপর সে এসে পড়ে—বুমেরাং যে রকম। গ্রীক ট্রেজেডিতে এই সত্যের প্রতীক হলেন দেবী এ-টি (ATE), শেক্সপীয়র নিজেই বলেছেন যেমন (আন্তনীর মুখ দিয়ে) :

> And Cæsar's spirit ranging for revenge,
> With Ate by side come hot from hell.

অর্থাৎ এ হল আমরা যাকে বলি কর্মফল—উৎকট কর্মফল, তারই চিত্র ট্রাজেডি। উৎকট কর্ম কাকে বলি? তীব্র দুষ্প্রবৃত্তি। দুষ্প্রবৃত্তি কি? কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য এই পরিচিত ষড়রিপুর নিরঙ্কুশ আবেগ। মানুষের অসংযত রাজসিক ও তামসিক প্রাণবৃত্তি। আর এদের প্রভু 'অহং'। অহম্মন্যতাই নিয়ে আসে অ-সাম্য। সৃষ্টিতে সমাজে গোষ্টিজীবনে প্রয়োজন যে অন্যোন্যাশ্রয়, পারস্পর্য, সঙ্গতি তাকে বিকল করে, ভেঙে দেয় এই অহংয়ের একদেশদর্শিতা। যা হোক, সে দার্শনিক তত্ত্বের কথা আমরা এখানে বিচার করছি না—আমরা বলছি তার ফলের কথা।

এই যে উৎকট কর্ম তার প্রথম ফল অবশ্য কর্মীর নিজের উপর। যে-কর্মী স্পষ্টই 'অয়মহং ভোঃ'-র প্রতীক, তার সম্বন্ধে ত কোন প্রশ্নই নাই। যে অহং-অজগর চায় আত্মপুর্তি, পরকে দংশন করে ভক্ষণ করে—নিজের বিষে কি রকমে যে নিজে ক্রমে জর্জরিত হয়ে ওঠে…পরকে ভক্ষণ করতে করতে নিজেকেই ভক্ষণ করে চলে সমানে, তার চিত্র চমৎকার দিয়েছেন

শেক্সপীয়র তাঁর ম্যাকবেথ ও লীয়রে। ওথেলো মনে হতে পারে ভিন্ন রকমের—তাঁর দুষ্কর্ম কি ? শুধু কি

...'Loved not wisely, but too well'

তাঁর প্রেমে আত্মদান নাই, আছে আত্মতর্পণ, ঈর্ষীয় ক্ষুধিতের অধিকার-স্পৃহা। তাঁর প্রেমাবেগ মনে হয় যেন কৃষ্ণবর্ণ গলিত ধাতুস্রাব—তাঁর নিভৃত প্রকৃতির পরিচয় তিনি নিজেই দিয়েছেন তাঁর শেষ চরম উগ্রতাপূর্ণ কথায় :

I look by the throat the circumcised dog
And smote him, thus.

ন্যায় পরিণতি নয় ঐ রকম ধাতুর মানুষটির ?

জুলিয়স সীজর আমাদের নিয়ে যায় যেন আর একটু উপরের স্তরে। বৃত্তিটি—উৎকট কর্মটি এখানে ঠিক রাজসিক বা তামসিক স্তরে নয়, তাকে তুলে ধরা হয়েছে বা ঢেকে রাখা হয়েছে একটা সাত্ত্বিকতার পর্যায়ে··· আদর্শের সেবক যাঁরা, উচ্চতর মহত্তর লক্ষ্য অনুসরণ করেন যাঁরা, অহং-সেবা নয়, যাঁরা চান দেশ-সেবা জন-সেবা মানবজাতি-সেবা—সীজর বা ব্রুটাস এই জাতীয় বিভূতি। কিন্তু সাত্ত্বিক অহংকারও কি কম রুদ্র, কম নিদারুণ নির্মম···উৎকট হয় ? অপরের জনসঙ্ঘের দেশের মঙ্গল করতে গিয়ে· ·যাকে সে মঙ্গল মনে করে···তাদের উৎসন্ন দিতে, একটা সর্বগ্রাসী ধ্বংস সাধন করতেও বাধে না। সীজর বলছেন যখন :

Know, Cæsar doth not wrong

বলছেন আরো :

I do know but one
That unassailable holds on his rank,
Unshaked of motion : and that I am he...

সাত্ত্বিক খোলসের ভিতরে কি 'অহমহং' কেটে পড়ছে !

অথবা ব্রুটস, যাকে সকলে মনে করে, নিজেও যিনি মনে করেন তিনি হলেন মহাসম্ভব উদ্ধারক দুষ্কৃত বিনাশক, বলেছেন যখন :

As he was ambitious I slew him—

এ অহমিকা মানুষের চোখে ধূলা দিতে পারে কিন্তু প্রকৃতিকে প্রাকৃত শক্তিধারাকে ভুলাতে পারে না—যে কর্মধারা এই চেতনা থেকে প্রবর্তিত হয়

তা ক্রমে উত্তাল আবিল প্লাবনে পরিণত হয়, সীমানার মধ্যে বা মানস ঔচিত্যবোধের মধ্যে তার ধ্বংসক্রিয়াকে আবদ্ধ করে রাখা যায় না।

গ্রীক চেতনায় কর্মগতি ও কর্মফল একটু ভিন্ন রূপ পেয়েছে ; ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা স্বাধীন প্রবৃত্তি সেখানে কর্মের গুণ (দোষ) নির্ধারণ করে নাই। সেখানে কর্ম হয়েছে নির্ব্যক্তিক, সামাজিক, বা (তাদের মতে) দিব্য-বিধানের প্রতিক্রিয়া যেন। 'মিডিয়া'-র কর্ম অবশ্য ব্যক্তিগত স্বনিয়ন্ত্রিত এবং তার নিজের দিক দিয়েই ঘোর কর্ম। কিন্তু রাজা ইডিপস নিজে ত ছিল সম্পূর্ণ নির্দোষ ও অজ্ঞ—তাকে দিয়ে যে কর্ম করান হয়েছে তা হল বিধি বিরুদ্ধ এবং মানবিক প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু ব্যক্তিগত অজ্ঞতা, নিজস্ব অন্তরের নির্দোষিতা অপকর্মকে নিষ্ফল করতে পারে না, কার্যত যা অপকর্ম তা অপকর্মই।

শেক্সপীয়র এই জিনিষটিকেই সুন্দর ব্যাখ্যাত করেছেন তাঁর বিখ্যাত 'more sinned against than sinning' বাক্যটিতে। দুষ্কর্মের, উৎকট কর্মের প্রকৃতিই হল দোষীকে শুধু নয়, কেবল সাহায্যকারীকেও নয়, অনেক সম্পূর্ণ নির্দোষীকেও, পুণ্যাত্মাকে পর্যন্ত, টেনে নিয়ে যায় একই প্রায়শ্চিত্তের বা বিনষ্টির মধ্যে। ব্যক্তিগত দুষ্প্রবৃত্তি বা দুষ্কর্ম ব্যক্তির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না, তা হয়ে ওঠে একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো, আগুন প্লাবন ঝড়ঝঞ্ঝার সংক্রামক ব্যাধির মতো। চোর ডাকাতের সঙ্গে কত নিরীহ সজ্জনও হয় সেখানে বিক্ষত বিনষ্ট। সৃষ্টি হল সবটা মিলে একটা গোটা জিনিস—সব পরস্পরে সংযুক্ত। ব্রুটাসের সঙ্গে পোরসিয়া, হ্যামলেটের সঙ্গে ওফেলিয়া, ওথেলোর সঙ্গে ডেসডিমোনা, লিয়রের সঙ্গে কার্ডেলিয়া একই ভাগ্য নিয়ে যেন তলিয়ে গেল। ট্রাজেডির শেষে বেঁচেবর্তে রইল যারা তা যেন তাদের নিজের গুণে, সুকর্মের ফলে নয়···তা নেহাৎ আকস্মিক ও অহেতুক ব্যাপারেই।

[২]

শেক্সপীয়রের যবনিকা অপরূপ বস্তু—বিকট একটা ঝড়ের পরে সব শান্ত সব পরিষ্কার। সত্যসত্যই মনে হয়, মনে শুধু নয়, অনুভব হয় :

After life's fitful fever he sleeps well.

প্রাণ বলে ওঠে যেন, ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শেক্সপীয়রের আরম্ভ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আমরা জানি। তিনি সূত্রপাত করেন কাহিনীর একেবারে মাঝখান থেকে (in medias res)—গল্পের ঐতিহাসিক আরম্ভ জানান হয় একটা, আজকাল সিনেমার ভাষায় যাকে আমরা বলি flash-back তা দিয়ে। আরম্ভেও শান্তভাব, আপাত প্রতীয়মান শান্তি, দুর্যোগের পূর্ব লক্ষণ যে শান্তি, গুরুভারাক্রান্ত শান্তি···মুক্ততার প্রসন্ন শান্তি নয়। স্মরণ করুন হ্যামলেটের আরম্ভ :

Zounds, who's there ?...

Not a mouse stirring—

একটা বিপ্লব বিপর্যয়ের পূর্বাভাস—তড়িৎ-তেজ—আকাশ বাতাস ভরে দিয়েছে। যুযুৎসু শক্তিরা ক্রমে জমায়েৎ হয়ে আসছে রণাঙ্গনে। মেঘ সাজছে, দেখতে দেখতে আকাশ ছেয়ে গেল, উঠল তুমুল ঝড়, তুফান—হল ভরাডুবি। কিন্তু তারপর···শেষে? উত্তাল বিক্ষুব্ধ সাগর তার প্রমত্ত ক্ষুধা মিটিয়েছে—এখন মুখে তার শান্তি, সহাস্য সূর্যকিরণোদ্ভাসিত। দুর্ঘটনা শোকদৃশ্য অতীতের স্মৃতিরূপে থেকে যায়, রেখে যায় কারুণ্যের কেমন একটা মধুর রেশ। যে দারুণ কাহিনী ঘটনাবলি আমাদের চেতনার রঙ্গমঞ্চ জুড়ে ছিল, দেখা দিয়েছিল সর্বগ্রাসী অতিকায় রূপে, যাকে মনে হয়েছিল একমাত্র সত্য বা বাস্তব সৃষ্টির মধ্যে, তাকে এখন বিশ্বনাট্যের মধ্যে ধরে দেখান হল, বিশ্বপটে একটা অতি সামান্য অংশ তার। যতই তা করুণ হোক না, বিশ্ব তাকে ছাড়িয়ে অনেকখানি, তার প্রাধান্য তেমন নয় যেমন মনে হয়েছিল অভিভূত চেতনায়। একটা বিশেষ পরিস্থিতির যে মর্মন্তুদ বেদনা (যাকে বলি ট্রাজেডি) তাকে সহজ করে সহনীয় করে মোলায়েম করে—প্রায় মুছে দিয়েই যায়···একটা উদারতর হস্তের স্নেহপ্রলেপ, চারদিককার অক্ষিৎকর দৈনন্দিন নিত্য পরিচিত অনিবার্য ঘটনাবলির যাদুস্পর্শ। বিশ্ব প্রকৃতির কোল থেকে হঠাৎ যেন উপস্থিত হয় ছোট একটি পরী, তার তারল্য ছড়িয়ে দিয়ে সে বলে যেন, 'আমিও আছি—কেবল শয়তান নয়'। এই যে তাঁর শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যের শেক্সপীয়র মনে হয় তিনি তাঁর সর্বশেষ নাটকখানিতে (Tempest-কেই অনেকে বিবেচনা করেন সর্বশেষ গ্রন্থ) রূপ দিতে চেয়েছিলেন তাঁর শেষের রহস্যটিকে। গভীরতর অর্থে এই হল ট্রাজেডির দান বা সার্থকতা —পরশুদ্ধি (Katharsis)।

[৩]

শেক্সপীয়র সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই তাঁর ভাষা সম্বন্ধে কিছু না বলে থাকা যায় না। এই ভাষায় যাদু সর্বজনবিদিত সর্বজন-আদৃত। এমন জীবন্ত প্রাণবন্ত ভাষা আর কারো হাতে এসেছিল কিনা সন্দেহ। মনে হয় ছুরি দিয়ে আঁচর দাও যদি কোথাও এর অমনি তাজা রক্ত ঝড়তে থাকবে। কি রঙে কি আলোয় ভরা সে লিখে গিয়েছেন এ ভাষা, মানুষ বা লেখক শেক্সপীয়র নয়।

আজ আমি এখানে শেক্সপীয়রের ভাষার একটা দিক দেখাব···কারণ তাঁর বৈভব প্রায় ঐশ্বরিক বৈভব,—কালিদাসের কথায় তা হল বিষ্ণু যেমন সাগরের মতই 'অনবধারণীয়', বলা যায় না তা এতখানি বা এই রকমের :

অনবধারণীয়মিদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা।

শেক্সপীয়রীয় বাক্যরীতি (স্টাইল) তিন ধরণের আমরা দেখতে পাই এবং তা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্থান বিশেষে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমত লক্ষ্য করি একটা জটিল দীর্ঘ-এলায়িত উচ্ছ্বসিত অসংহত লীলাভঙ্গ। উদাহরণ বিখ্যাত হ্যামলেটীয় ভাষণ :

Whether 'its nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrangeous fortune,
Or to take up arms against a sea of troubles,...

এই বাগ্‌বৈখরীর বিরুদ্ধে অনেক ন্যায়াধীশ সমালোচকের বাক্যবাণ বর্ষিত হয়েছে, বর্ষিত হয়েছে এর অসংলগ্নতার অভ্যুক্তির বিরুদ্ধে। কিন্তু তবু সাহিত্যে এ বস্তু টিঁকে আছে তার নিজস্ব সার্থকতায় ও গৌরবে। প্রথমত এ রীতিতে প্রতিফলিত হ্যামলেট-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য—হ্যামলেট জটিল চরিত্র, কবিমনীষীর চরিত্র, বৃত্তি ও প্রবৃত্তি-বৈচিত্র্যের যুগপৎ আত্মপ্রকাশ প্রচেষ্টা। ম্যাকবেথের :

If it were done when 'tis done, then 'twere well—

ইত্যাদি এই একই রীতির পরিচয় দেয়। দ্বিতীয়ত,তাতে আবার এলিজাবেথীয় যুগধর্মেরই স্বভাব প্রতিফলিত। ন্যায়শাস্ত্রাতিরিক্ত, তর্কবুদ্ধিবিমুক্ত একটা ভাবগাঢ় চিন্তস্রোতের প্রখর উদার ছন্দায়িত গতি শেক্সপীয়রীয় যাদুর এক বৈশিষ্ট্য। শেক্সপীয়রের দ্বিতীয় রীতি হল ঠিক এই ন্যায়শাস্ত্রানুগ ক্লাসিকাল ভঙ্গী। সেখানে কথা সব ওজন করে এবং ভারী ভারী কথা চয়ন করে, সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর গঠন ইমারত তৈরী হয়েছে যেন। শুনুন সীজরেরই কথা :

If I could pray to move, prayers would move me : ইত্যাদি।

এ বলা যাকে বলা চলে rhetoric is excelsis—পরিচ্ছন্ন সুগঠিত সংহত চিন্তাভূয়িষ্ঠ বাক্‌শ্রেণী। অবশ্য পাগল লীয়র যে বাক্‌সমারোহ সাজিয়ে তুলেছেন তার ধ্বনি-গৌরব, ছন্দায়িত তরঙ্গ-দোল মিলটনকেও হারিয়ে দেয় :

অথবা স্মরণ করতে পারি বহ্বাক্ষর গুরুভার,

The multitudinous seas incarnadine.—Macbeth.

শেষত, শেক্সপীয়র হতে পারেন অতি সহজ, অতি সরল, নিরাভরণ অনাবৃত আন্তরিক···প্রগল্‌ভতা নয়, চাতুর্য নয়, সেখানে ধরা দিয়েছে কুমারীর দেহের তন্বীশ্রী—যদিও তারই মধ্যে ফুটে উঠেছে পরিণত চেতনার পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, এই যেমন বর্তমান নাটকখানির মধ্যেই পাই :

Time is come round

And where I did begin, there shall I end.

তাই বলতে ইচ্ছা হয় শেক্সপীয়র কবি নন, তিনি হলেন যাদুকর···কথা দিয়ে এমন ভিল্কী খেলেন যে তার তুলনা নাই। কথায় যা নাই, তিনি কথার মধ্যে তা ভরে দেন, দেন এমন একটা সুর ও ছন্দ এমন একটা অনুভূতি চমৎকারিত্ব যে তা হয়ে ওঠে এক অপরূপ সৃষ্টি। যেমন না সেই অতি পরিচিত লাইন কটি—কবিত্বের রস-সার বলা যেতে পারে :

daffodils

That come before the swallow dares, and take

The winds of March with beatdy.....

কিম্বা

In such a night

Stood Dido with a willow in her hand

Upon the wild sea-banks, and waft her love

To come back to Carthage.

যেখানে লাইন কয়েকের মধ্যে Virgil-এর প্রায় একটা সমগ্র সর্গের করুণ কাহিনী ভরে দিয়েছেন। আরো :

Look how the floor of heaven

It thick inlaid with patines of bright gold—

বিনা কারণেই কি অপণ্ডিত সাধারণ পাঠকেরা বলে ওঠে—শেক্সপীয়র ? ও ত শুধু উদ্ধৃতিতে পরিপূর্ণ !

আমিত্বের যুগ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(সুদর্শনের কথা)

…বিংশ শতাব্দীর সব-অস্বীকারী আমি, কিন্তু আমার জীবন-প্রশ্নকে অস্বীকার করিনি। অস্বীকার করতে চাইলেই বা পারবো কেন? গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করা যায়, কিন্তু আত্মাকে ফাঁসি দেব কী করে? আত্মার আর্তনাদকরা প্রশ্নের সম্মুখে আমার মত বিংশ-শতাব্দীর মানুষের যে লজ্জার সীমা নেই, আত্মগ্লানির অবধি নেই।

আমার পিতা কে? আমার কুলধর্ম কী?

আমার মত মানুষ বিংশ শতাব্দীতে কম নেই। অনেক! অনেক! এ যুগে অর্থনীতিশাস্ত্র, রাজনৈতিক দর্শন প্রগল্‌ভ হয়ে উঠেছে, কিন্তু এ প্রশ্ন থামেনি। আবার প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে লাগলাম। শান্তির সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় উঠিয়ে দিলাম। বাড়িতে রইল একান্ত আশ্রিতার মত।

পড়াশুনা আরম্ভ করলাম। দোকান ভালই চলছিল। পাড়ার ছেলেরা আড্ডা দিত। তাদের তর্ক শুনতাম। মধ্যে মধ্যে তরুণ-তরুণী আসত, কেবিনের খদ্দের। দোকানের জন্য পুরনো মাসিক পত্র কিনে এনে রাখতাম। নিজে পড়তাম। তার মধ্যে মনের প্রশ্নের প্রতিধ্বনি পেতাম মধ্যে মধ্যে। মৃত ঈশ্বরকে নিয়ে কবিতা, প্রবন্ধ লিখতাম। এরই মধ্যে মহাপ্রয়াণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। বাস্, শেষ হয়ে গেল। আর 'তুমি'কে নিয়ে কেউ কাব্য রচনা করবে না। এবার শুধু 'আমি'। বাস্। শেষ।

এরই পর এল যুদ্ধ। না, ভুল হল। যুদ্ধ এসেছিল, কিন্তু তখনও স্ব-রূপে নিজেকে প্রকাশিত করেনি। বিয়াল্লিশ সনে অকস্মাৎ পুরনো কালের পর্দাটা ছিঁড়ে গেল—না, ঝড়ে উড়ে গেল। বিংশ শতাব্দীর পর্দাটা প্রকাশিত হল আপন স্বরূপে। আমার মনের চোখে কী দেখলাম জান? একটা মরুভূমির দৃশ্যপট। জল নেই, সবুজ নেই, ছায়া নেই, দগ্ধ প্রান্তর, দগ্ধ আকাশ, বিলীন দিগন্ত। তারই সম্মুখে মরীচিকার মত—না, রঙ্গমঞ্চে রঙমাখা নর্তকীর মত নাচছে অর্থনীতির রঙ্গিনীর দল; রাজনৈতিক দর্শনবিদ পরিষদের দল উচ্চকণ্ঠে

বক্তৃতা করছে; আর পৃথিবী সুদ্ধ মানুষ পরস্পরের টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবার জন্য বদ্ধপরিকর। রক্তে পৃথিবী ভাসছে।··

আবার বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম।

মনে হল, 'কে আমার পিতা'—এ প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেছে।

উত্তর পেয়েছে মানুষ;—সে স্বয়ম্ভু। তার ভাই নেই, জ্ঞানি নেই। শুধু সে আছে। দল আছে। দলের নেতা আছে। বুনো জানোয়ারের দল। নখদন্তের বদলে তার হাতে উদ্যত খড়্গ। দলে দলে জাতিতে জাতিতে তাই হানাহানির মধ্যে মীমাংসা হচ্ছে—কে থাকবে, কে থাকবে না। অথবা আদি নেই, অন্ত নেই,—জন্মের আগেও শূন্য, পরেও শূন্য; মধ্যে আছে শুধু বর্তমানটা —সেটা কেন থাকবে অর্থহীনভাবে? সুতরাং সেটাকেও শেষ করে দাও নিজেরাই। নিজের হাতে। শক্তি ছিন্নমস্তা হয়েছিলেন কি এই চিন্তাতেই? অর্থনীতির রঙ্গিনীরা নৃত্য করছে, তাদের অঙ্গ থেকে ঝরে পড়ছে অর্থ। সেই অর্থ যে যত পার কুড়িয়ে নাও। প্রচুর ভোগ চারিদিকে, ভোগ কর আর মরণ-বহ্নিতে ঝাঁপ দাও। প্রশ্ন নেই···প্রশ্ন নেই।

আমি সামান্য মানুষ ই, কিন্তু আমার চেয়ে অসামান্য মানুষ তো অনেক। যারা অঙ্ক কষে ব্রহ্মাণ্ডের পরিধি নির্ণয় করে, শক্তিকে নব নব রূপে ভঙ্গিতে আবিষ্কার করে, পরমাণুর মধ্যে মহা বিরাটের অবস্থান কল্পনা করে···তারা, শিবনাথ, তারাও সেদিন এই হানাহানির বিভ্রান্তির মধ্যে, সেই বিরাট বিপুলের মধ্যে অমৃত, যার মধ্যে 'আমার পিতা কে'—এই চিরন্তন প্রশ্নের উত্তরের আভাস মিলতেও মিলতে পারত, সেদিকে তারা দৃষ্টি দিলে না। তারা অমৃতকে আবিষ্কার না করে আবিষ্কার করলে মৃত্যুকে। মৃত্যু চিরকালই যবনিকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে। আবৃত করে রেখেছে চিরন্তন অজ্ঞানকে। তাকে তুলতে গিয়েও তুলতে পারলে না, বিভ্রান্ত হয়ে গেল। মৃত্যু-শক্তির অধিকারী হয়ে ভাবলে···বোধ হয় আমিই ঈশ্বর। আমারও তাই হল। বিভ্রান্তিতে পড়লাম। 'কিছু নাই'—এও আর থাকল না; হল 'আমিই সব'।

[লেখকের সম্মতিক্রমে তাঁর সদ্য প্রকাশিত "যোগভ্রষ্ট" গ্রন্থ থেকে মুদ্রিত]

সাহিত্যের তর্ক

পশুপতি ভট্টাচার্য

আমরা দু'জন, দুই বন্ধু।

মনের মিল না থাকলে বন্ধুত্ব হয় না। তা ঠিকই আছে—পরস্পরকে দেখে খুশি হই, কাছে এলেই বসতে বলি। চা খেতে দিই, আদর আপ্যায়ন সবই করি। কিন্তু মতের মিল নেই। তর্ক লেগে যায়। কেউ তখন নিজের গোঁ ছাড়েনা।

বন্ধু বলে—কী সব ছাই পাঁশ তোমরা লেখো! কোথায় ভগবান তার নেই ঠিক, তার সঙ্গে নাকি মানুষের যোগ! আর যত সব উড়ো উড়ো কথা, যার কোনো মানে হয় না। যা কোথাও নেই, কোথাও চোখে দেখা যাচ্ছেনা, তাই নিয়ে মাথাব্যথা। কে পড়ে তোমাদের ও সব অধ্যাত্ম-পনা, ভয়ে পাতা উল্টে কেউ দেখেও না। তার চেয়ে রসালো রকমের সাহিত্য কিছু লেখো, যা পাঁচজনে পড়বে।

আমি বলি—এগুলো বুঝি সাহিত্য নয়? এই হলো সব চেয়ে সেরা সাহিত্য, যা মানুষকে মানুষের চেয়েও বড়ো হতে শেখায়, ছেলে ভুলোনো চুষিকাঠি মুখে ধরিয়ে দিয়ে বলেনা যে ফুরসৎ পেলেই এইটি চুষতে থাকো। মানুষ কি চিরদিন কচি খোকা থাকবে, তার কি বয়স বাড়ছে না? তাকে উপরের জিনিস দেখাতে হবেনা, কেবল নীচের পাঁকের গাদাই উল্টেপাল্টে হরদম দেখিয়ে যেতে হবে?

বন্ধু বলে—উপরে যদি কেউ গিয়ে থাকে তবে তারাই লিখুক উপরের সাহিত্য, আর তাদের দলের লোকই তা পড়ুক। মানুষ লিখবে মানুষের সাহিত্য, যা সাধারণ মানুষরা পড়বে। বাঘেদের যদি ভাষা থাকত, তারা লিখত বাঘেদের জীবনের সাহিত্য। পাখিদের ভাষা থাকলে তারা লিখত তাদের জীবনের সাহিত্য। আমি তো এই বুঝি। জীবনে যাকে ধরাছোঁয়া যায়না তাই নিয়ে লেখালেখি কেন?

আমি বলি—মানুষের সাহিত্য তাহলে তুমি কাকে বলবে? কেবল গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা, আধুনিক কাব্য আর গান, এই সব? মানে

আজকাল যেমন সব বইতে আর পত্রিকাতে বেরোচ্ছে সেইগুলো? সাহিত্য তুমি কাকে বলো?

বন্ধু বলে—হাঁ, আমি তাকেই বলছি সাহিত্য যা লোকে পেলেই আগ্রহ করে পড়ে। যা পড়তে মজা লাগে, আর বুঝতে কোনো কষ্ট হয়না। যা পড়তে পড়তে সময়টা কোনখান দিয়ে কেটে গেল তা বোঝাই যায় না। যা লোকে গাঁটের পয়সা দিয়ে কিনে পড়ে, বাজারে বেরোলে যা পড়তে পায়না। দেখছ তো, আজকালকার সাহিত্যের কত কাটতি। মানুষ যতই রস বুঝতে শিখছে ততই তারা এই সব সাহিত্য কিনছে আর পড়ছে।

আমি বিব্রত হয়ে বলি—সত্যি কথা, পড়ার আগ্রহ লোকের বেড়েছে বটে, কিন্তু সে আগ্রহ তাদের মিটছে কৈ? বইএর লোভনীয় নাম দেখে, নামকরা লেখক দেখে, লাল নীল রং দেখে, মলাটের ছবির চেকনাই দেখে, বিজ্ঞাপনের চটক দেখে লোকের আগ্রহ তেতে উঠছে আর তারা সেগুলো সংগ্রহ করে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে পড়ছে। কিন্তু তার পরে মুখ বেঁকিয়ে তারা কি সব কথা বলে, তা কি শুনতে পাওনা? তুমি লাল টুকটুকে দেখে আম কিনে ঘরে নিয়ে গিয়ে খেয়ে দেখলে মিষ্টি নয় টক্, অথচ পয়সার জিনিস ফেলতেও পারোনা, কোনরকমে এখান ওখান থেকে খানিক খেয়ে তা ফেলে দিয়ে মুখ মুছে ফেল। কোনমতে খেলে বটে, কিন্তু সেকি তোমার আম-খাওয়া হলো? কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলো যে বাইরের রং দেখিয়ে গালে চড় মেরে ঠকিয়ে দিয়েছে।

বন্ধু বলে—ঐ তো সাহিত্যের মজা, এখনকার সাহিত্য হবে টক্-টক্ মিষ্টি-মিষ্টি, একটু ঝাল্-ঝাল্। মনের আশা খুব বাড়িয়ে দেবে, কিন্তু মেটাবে না। লোভের জিনিস দূর থেকে একটু দেখিয়েই হাত গুটিয়ে নেবে। একটু চেতানো তাতানো হলো আর কি।

আমি বলি—কিন্তু ওতে খুশি কেউ কি সত্যিই হয়? ভালো কি সত্যিই লাগে? তাহলে আজ যেটা পড়ি কাল সেটা ভুলি কেন? আজ যে বই বেরোলো, ছ'মাস যেতে না যেতেই সে বই চাপা পড়ে যায় কেন? তুমি দেখছনা, মানুষের হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাই পড়ছে, কিন্তু তাতে মন ভরছেনা, আবার নতুন কিছু চাইছে।

বন্ধু বলে—ঐ তো এখনকার সাহিত্য। যেমন যুগ তেমনি লিখতে হবে। মানুষ যা চায় তাই বুঝে তো লেখা দরকার। নয়তো এ ছাড়া তুমি আর কোন রকমকে সাহিত্য বলতে চাও শুনি?

আমি বলি—মানুষ চায় আনন্দ। আনন্দের জন্যে সাহিত্য, এই আমি বুঝি। লেখকের যা লিখে আনন্দ, আর পাঠকের যা পড়ে আনন্দ হবে। এখনকার এই সব যা লেখা হচ্ছে তার মধ্যে উত্তেজনা আছে, ইন্দ্রি-বিন্দ্রি আছে, খিস্তি আছে, স্নায়ু সুড়সুড়ি আছে, কিন্তু আনন্দ কই? ক্ষোভই থাকে, তৃপ্তি কই? ব্যর্থতাই থাকে, সার্থকতা কই? মানুষের জীবনকাহিনী বলা হয়, কিন্তু মানুষের জীবনে কি আনন্দ নেই? জীবনে কি আনন্দের কিছু নেই?

বন্ধু বলে—তুমি এখনকার যে সব বিষয়বস্তুর উপর ঠেস দিয়ে বলছ, তাও তো মানুষ খোঁজে, তার মধ্যে তারা আনন্দ কিছু পায়না বলতে চাও?

আমি বলি—আমি কোনো বিষয়ের ওপর ঠেস দিতে চাইনি, আমি কেবল লেখার কথাই বলছি। আনন্দ থাকবে না কেন, সকল দিকের মধ্যেই আনন্দ আছে। কিন্তু তা খুঁজে পাওয়া চাই আর তা পরিবেশন করতে জানা চাই। এরা তা পরিবেশন করতে জানেনা, কিংবা জানলেও করেনা।

বন্ধু বলে—তুমি যে তেমনি কথা বলছ, লোকে যেমন বলে অমুক ডাক্তার ডাক্তারি জানেনা, অমুক উকিল ওকালতি জানেনা, অমুক কুমোর গড়তে জানেনা, অমুক লেখক লিখতে জানেনা, অমুক রাঁধিয়ে রাঁধতে জানেনা—

আমি বলি—না না, জানবেনা কেন, কিন্তু জেনেও করেনা, সেই তো দুঃখ। তুমি আজকাল দেখতে পাচ্ছনা, প্রত্যেক লেখকেরই এক আধটা মাত্র লেখা ভালো উতরে গেল, তারপর আর যা কিছু লিখল, হয়তো বিস্তর লিখল, কিন্তু সমস্তই ট্র্যাশ। তার মানে কি? তার মানে ভালো কিছু দেবার মতো প্রেরণা নেই, সাধনা নেই, আকিঞ্চন নেই—আর উপরের দিকে চোখ নেই, কেবল নীচের দিকে চোখ।

বন্ধু বলে—লেখার আবার সাধনা কি? যার ক্ষমতা আছে সে এমনিই লিখবে।

আমি বলি—তা হয়না। বঙ্কিম যে বঙ্কিম, তিনিও কত সাধনা কত তপস্যা করে তবে একখানি বই লিখতেন, কত কাটতেন, কত বদলাতেন, লিখে সেটা বছর দু বছর ফেলে রাখতেন, কত লোককে পড়ে শোনাতেন তবে ছাপতে দিতেন। তাতে কি ফল হতো, তা একখানি তাঁর বই খুলে একলাইন পড়লেই বুঝবে। ঐ দেখ, স্কুলের ছেলেদের একখানা পাঠ্য বই "রজনী", অনেক বাদ দিয়ে ছাপা। এ বই তো বহুদিন আগে কতবারই পড়েছি সংখ্যা নেই, কিন্তু কাল হঠাৎ ছেলেদের টেবিল থেকে তুলে নিয়ে যেমন একটু পড়লাম অমনি অবাক হয়ে গেলাম। সমস্ত মনটা আনন্দে ভরে উঠল, যেন সবে নতুন পড়ছি। "বেশী নয়, দু চারটে লাইন তোমাকে পড়ে শোনাই, তোমারও তাই মনে হবে··· "বলিয়াছি ত, কাণার সুখদুঃখ তোমরা বুঝিবে না; সে নবনীতসুকুমার পুষ্পগন্ধময় বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ। বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ—যার চোখ আছে সে বুঝিবে কি প্রকারে?···বহুমূর্ত্তিময়ি বসুন্ধরে!···যাহার করস্পর্শে এত সুখ সে দেখিতে কেমন? এক মুহূর্ত্তের জন্য এই সুখময় স্পর্শ দেখিতে পাইনা? দেখা মা, বাহিরের চক্ষু নিমীলিত থাকে—থাকুক মা! আমার হৃদয়ের মধ্যে চক্ষু ফুটাইয়া দে, আমি একবার অন্তরের ভিতর লুকাইয়া মনের সাধে রূপ দেখে নারীজন্ম সার্থক করি। শুধু দেখা—কারও ক্ষতি নাই, কারও কষ্ট নাই, কারও পাপ নাই, সবাই অবহেলে দেখে, কি দোষে আমি কখন দেখিব না?" কি বল, শুনে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে কিনা? এ লেখা কি আরো একশো বছর পরেও পুরোনো হবে? এর মধ্যে তোমরা যে জিনিস চাইছ তা সবই রয়েছে, কিন্তু তা ছাড়াও যা আছে তা এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দবোধ। তোমার অন্তরকে তা স্পর্শ করেছে। কেন করেছে জানো? তাঁর প্রতিভার সঙ্গে সাধনা ছিল, আর উপরের বা অন্তরের আনন্দের দিকে একটা দৃষ্টি ছিল, তাই। এমন সাধনা এমন দৃষ্টি থাকলে এখনকার প্রতিভার লেখকরাও কিছু অন্তত আমাদের দিতে পারে।

বন্ধু বলে—তুমি সেকালের মতো জিনিস একালে চাইছ। তা ক হয়? সেকালের লেখা সেকালের মতো, একালের লেখা একালের মতে হবে।

আমি বলি—তা হোক না, কিন্তু এদেশের সাহিত্য এদেশের মতো নিশ্চয় হবে। এখন তাই কি হচ্ছে? এখনকার লেখা পড়ে বোঝা যায়

না যে কন্টিনেন্টের বা হনোলুলুর প্রেমের গল্প পড়ছি না আমাদের ভারতের পড়ছি।

বন্ধু বলে—প্রেমে কোনো দেশের ছাপ মারা থাকেনা ভাই, প্রেম সব দেশেই একই জিনিস। সে কথা ভুলে যাও কেন।

আমি বলি—হলেই বা এক জিনিস। জগতের স্ত্রীলোক একই জাত, কিন্তু কোথাও তাকে শাড়ি পরতে হয়, কোথাও ঘাঘরা পরতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বিলেতী কাণা ফুলওয়ালিকে দেখেই দেশী রজনী এঁকেছিলেন, তার মধ্যে প্রেমও ছিল সবই ছিল, তবু সে খাঁটী বাঙালী হলো। তার কারণ এদেশের ছাপ তার রেখায় রেখায়। বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর ছাপ থাকবেনা? তার প্রেমে পাটোয়ারি লেনদেনের সম্পর্কের বদলে খানিকটা এদেশীয় সুরভিভুক্ত স্নেহপ্রীতির সম্পর্ক থাকবে না? তার চরিত্রগুলির মধ্যে ভগবৎ বিশ্বাস, ভক্তি, সংযম, সংকোচ, নমনীয়তা, লজ্জা—যা বাঙালীর বিশেষত্ব সেগুলো কিছুই থাকবে না? যে সাহিত্যে ভারতের কোনো ছাপ নেই তাকে তুমি ভারতীয় সাহিত্য বলবে? এগুলো যে ইংরেজী আধুনিক বইকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে।

বন্ধু বলে—ওহে ভাই, এখন তাই তো হবে, এ হলো realismএর যুগ।

আমি বলি—শোনো শোনো, আমার বন্ধু অনির্বাণ চিঠি লিখেছেন। তাতে realism সম্বন্ধে তিনি কি বলেছেন শোনো—"আজকাল লেখকরা আর মানুষের মনের গভীরে ডোবেন না। যাদের কথা তাঁরা লেখেন তারা রাম শ্যাম যদু মধু—যাদের মনের বালাই নাই। তাই লেখাও হয় কেবল কথার কেনা আর প্রাত্যহিক তুচ্ছতার জাবরকাটা। Realism নিশ্চয়, কিন্তু imagination নাই। বিজ্ঞান যেমন বলে আমরা why জানিনা, how বলতে পারি। আধুনিক লেখকরাও তেমনি কেবল how নিয়ে হাউ হাউ করছেন।"

বন্ধু একটু মুচকি হেসে চুপ করে রইল, কথা বললেনা। বোধ হয় ভাবলে, এর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

আপনার পণ্যের বহুল প্রচারের জন্য সর্বদা 'জাগরী'তে বিজ্ঞাপন দিন।

কু রু ক্ষে ত্র

ভ্রমর'

প্রথম অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য

[কলকাতা শহরেই একটি পুরনো দরগা অদূরে ; দৃশ্যে দরগার সামনের পথ—তিনটি পথ এসে মিলেছে সামান্য দূরে। যানবাহনের শব্দ প্রচুর। সময় : প্রাক্‌সন্ধ্যা। আনুষ্ঠানিকভাবে দরগার ভিতরে সজ্জিত, বাইরে অনেক লোকের ভিড়···জাতিধর্ম নির্বিশেষে···আবালবৃদ্ধবনিতা—খণ্ড জনতা। কেউ এসেছে কবচ নিতে, কেউ ঝাড়তে, কেউ বা মানত দিতে। ভিতরে লাল সিল্কে জড়ানো বেদী, চারপাশে অজস্র মোমবাতী জ্বলছে। বেশ থম্‌থমে ভাব চারদিকে। প্রবেশ পথে একজন মোল্লা উঠ বস করে নমাজ পড়ছেন। সবাই চুপ করে আছে হঠাৎ সকলের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল। লুঙ্গি পরনে একটা ধাবমান লোকের পিছনে কিছু লোক উন্মত্তভাবে ছুটে এলো।]

লোকগুলো : ধর, ধর, পাকড়াও পাকড়াও—

জনেক : চোর চোর পকেটমার···পকেট...

[দরগার সামনের পথে এত লোকের মধ্যে লোকটি হকচকিয়ে গেল এবং ধরা পড়লো। তার উপর তখন কেউ ঘুসী, কেউ চড়, গাট্টা চালাতে লাগলো।]

লোকটি : খোদার কসম্ ও ভাইসবরা আমি···আমি চোর নই···আমি ···আমি···

১ম লোক : না তুমি পীর ···শা : মার মার···(আবার প্রহার)

লোকটি : ই আল্লা বিসমিল্লা !

[আবার প্রহার চল্‌লো। একজন যুবক এগিয়ে এলো ; অবিন্যস্ত চুল, আধময়লা বেশবাস দীপ্ত চোখ-মুখ।]

যুবক : ননসেন্স্ ! থামুন থামুন কেন মারছেন ওকে, কেন ? পুলিশ রয়েছে না, আপনারা মারবার কে ?

[এবার জনতা হকচকিয়ে গেল। যুবকটি এগিয়ে গেল, হাত ধরে টেনে আনলো লোকটিকে—২২।২৩ বছরের তরুণ। দুজনেরই বয়স প্রায় এক। লোকটির পরনে ছেঁড়া লুঙ্গি ও বোতাম-খোলা সার্ট ··মুখ-চোখ সরল। কাছে একটি বিধবা তরুণী দাঁড়িয়েছিল, তার সঙ্গে একটি বালক, সে তাড়াতাড়ি বালকটিকে কোলের কাছে টেনে নিল।]

১ম লোক : কে আপনি···চোরকে মারবো না···ভারী তো !

যুবক : না সে অধিকার নেই আপনাদের···আদালত রয়েছে না ? জেলখানা, থানা আছে না ? যে সব আপনাদেরও দরকার ছিল !

২য় লোক : দাদার দলের লোক নাকি !

বিধবা তরুণী : না না···ও না···ও যে বিদ্যুৎ। [যুবক পিছন ফিরে তাকালো।]

যুবক (বিদ্যুৎ) : লতিকা তুমি এখানে ! [জনতার মধ্যে অস্ফুট গুঞ্জন। জনতার দিকে ফিরে আবার বলল] দেখুন, চোরের দলপতি হলে গড়ের মাঠে কিম্বা হাইকোর্টের কাছের বড় বাড়ীতে দেখতে পেতেন···সৌভাগ্যক্রমে সেটি হতে পারিনি। যাক কি আর বলবো আপনাদের···কথাতেই বলে জনতা অন্ধ ! কিন্তু লোকটার অবস্থা দেখছেন···দাঁড়াতে পারছে না···হয়তো সারাদিন কিছুই খায়নি। মুখ দেখছেন···চোরের মুখ ?—

১ম লোক : রেখে দিন দাদা, ডু ইউ নো ইয়াগো ইন ওথেলো ! এদের রীতিমত গ্যাংগ্ আছে···ইণ্টার প্রভিন্সিয়াল গ্যাংগ্ ?

বিদ্যুৎ : ভাল কথা···বাঁচবার জন্য এরা তবু দল বেধেছে কিন্তু আমাদের ভালমানুষদের দল কোথায়···আমরা সেটিও পারিনি ! একটা নিরীহ লোকের উপর এতগুলো লোক মিলে হামলা চালাচ্ছেন, এরপর কে কোথায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন। মারতে আর মার খেতে দল হয় বুঝলাম। কিন্তু খানিক পরেই ট্রামে বাসে ভিড়ের ঠ্যালায় অনেকে এখানকার সহকর্মীর সঙ্গে লড়তে শুরু করবেন···আশ্চর্য !

বালক : ও কাকীমা, ওটা চোর ?

লতিকা : না বাবা, গরীব মানুষ। খেতে চেয়েছে বলে সবাই মিলে মারছে !

বালক : খেতে চাইলে মারে কেন মা—আমি খেতে চাইলে তুমি মারবে কাকীমা ?

লতিকা : নারে মানিক, আমি কি তোকে মারতে পারি ! [আদর করলো]

বিদ্যুৎ : এরা এই জনতা তোমায় মারবে···এদের চিনে নাও—এখন থেকেই চিনে নাও খোকা, এরই নাম অন্ধ জনতা !

অপর যুবক :—(অন্যদিক থেকে এগিয়ে এলো) কবন্ধ বলুন।

বিদ্যুৎ : হ্যাঁ তাও বলা যায়।

[দরগার দরজায় মোল্লার নমাজ শেষ হলো···তিনি তার ধর্মীয় আহ্বান করতেই অর্দ্ধেক লোক সেদিকে চলে গেল। লতিকাও গেল ; বিদ্যুৎ একবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো, তারপর লোকটার দিকে ফিরে কথা বলল।]

আমাদের রাজত্ব হলে তোমাকে ছেড়েই দিতাম, কিন্তু তা যখন নয়—তখন তোমাকে পুলিশের হেফাজতে যেতেই হবে ভাই।

লোকটী : বিশ্বাস করুন খোদার কসম্—

নবযুবক : খোদাকে আর টেনো না ভাই, খোদার উপর খোদকারী করবার লোক পৃথিবীতে এখন অনেক, কি বলুন ? তা তুমি বুঝি এ লাইনে নূতন ?

লোকটী : দু'দিন কিছু খাইনি জনাব !

১ম লোক : খাবে পাঞ্জাবী রুটি আর মাদ্রাজী ডাল—শ্বশুরালয়ে তো যাচ্ছ।

বিদ্যুৎ : থাক আর রসিকতা করবেন না ভাই, মধ্যবিত্ত ঘরের তুলনায় এদেশের জেলখানা শ্বশুরবাড়ী বৈকি ! এই যে পুলিশ—ও ভাই, (চোরকে ধরে এগিয়ে গেল) একে তোমাদের কাছে নিয়ে যাও তো—এ নাকি চুরি করেছিল !

লোকটি : না না আমি চুরি করি নাই···চোর না আমি···আমি মানুষ, এমনি মানুষ···আমি···[জনতা চোরকে ধরলো]

বিদ্যুৎ : সে কথাই এদের কাছে গিয়ে বল, এখানে মানুষগুলো দেখছো না—ক্ষেপে আছে, পাগলদের মধ্যে তুমি আর বিচার চেয়ো না···যাও এদের সঙ্গে, ক'দিন আর ? বড় জোর দিন পনেরো তারপরেই ছাড়া পেয়ে যাবে··· বুভুক্ষু চোরে জেলখানা ভরে আছে ক'দিন আর ধরে রাখবে।

[লোকটিকে ধরে দু'জন লোক চলে গেল, ভিড় আরও কমে গেল। সামান্য দূরে দরগামুখী হয়ে অনেক লোক তখনও অপেক্ষমান, তাদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। আঁচলে কি বেঁধে লতিকা এদিকেই ফিরে এলো।]

নব যুবক : আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো ?

বিদ্যুৎ : আপনাদের পার্টি অফিসে। 'গণমুক্তি'তে সাহিত্য বিভাগে একটা লেখা নিয়ে গেছিলাম মাস কয়েক আগে। লেখাটি অমনোনীত হয়েছিল ! আপনার নাম প্রদীপ মিত্র, সহকারী সম্পাদক, নমস্কার।

প্রদীপ : নমস্কার···[লতিকা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল]

বিদ্যুৎ : ভাল আছ তো লতিকা···চল্লে নাকি ?

বালক : ও কে মা ?

লতিকা : তোর একজন কাকা।

বালক : ইঃ কাকা বুঝি এখানে থাকে···সে তো অফিসে।

লতিকা : সব কাকাই কি অফিসে থাকে নাকিরে বোকা···পথের কাকা এটি···বাউণ্ডুলে। [লতিকা কটাক্ষ করলো বিদ্যুতের দিকে]

প্রদীপ : ওর আর দোষ কি বল, কলকাতার হাড়ে-মাসে মানুষ, অফিস ছাড়া বুঝবেই বা কি !

বালক : আচ্ছা কাকীমা, মোল্লা সাহেব একবার উঠছিলেন আর একবার বসছিলেন কেন ?

লতিকা : ভগবানকে ডাকছিলেন।

বালক : ভগবান কে মা ?···জেঠামণির অফিসের সেই বড়বাবু ? সেদিন তো আমাদের ওঘরে এসে বসলো, আর তুমি খালি একবার উঠছিলে আর একবার বসছিলে !

লতিকা : দীপক, বড্ড বেশী বকছো তুমি !

বিদ্যুৎ : এস লতিকা, পথের কাকার সঙ্গে আর সময় নষ্ট না করলেই ভাল !

লতিকা : একদিন এস না আমাদের বাড়ীতে···একেবারেতো আস না !

বিদ্যুৎ : আশাহীনের আসা তবু আশা রইলো—!

লতিকা : আমি যাই ওরা আবার সব এসে পড়বেন !

[প্রস্থান]

বিদ্যুৎ : প্রদীপবাবু, প্রদীপের তো আলো হয়—দেখতে পান কিছু ?

প্রদীপ : দেখতে পাই বলেই তো এসেছি এপথে।

বিদ্যুৎ : মানে রাজনীতিতে—তাই বলুন, সেই বলেই লেখাটা ছাপেন নি! যাই বলুন আপনাদের ব্যবসাটি মন্দ নয়, নো ক্যাপিটাল···খালি গরম বক্তৃতা!

জনৈকা বৃদ্ধা : (নেপথ্যে, অদূরে) ও মৌলানাসাব, বাঁচান না আমার ছাইলাডারে—আহা আর যে কেউ নাই আমার—কচি বৌডা ঘরে!

মৌলনা : কি যেন হয়েছে ছেলের ?

বৃদ্ধা : কি আর—রাজরোগ!

বিদ্যুৎ : রাজনীতির সঙ্গে মিল আছে যা হোক!

মৌলনা : যক্ষা বিস্‌মিল্লা—সবই খোদার কসরৎ আমি কি করতে পারি!

বৃদ্ধা : পার বাবা পার তোমরা—দশনার আগের ইষ্টিশানে মাইয়াডারে নিয়া গ্যালা তোমরা—রাত-বিরাতে আইজও বুকডা মোচর দিয়া উঠে—কোথানে যে আচে আবাগী! ও মা কালী—কোথায় রাখছো তারে! পোলাডা কলে খাটে তাও যে বাঁচে না! তোমাগো আল্লারে ইটু কও না মোল্লা সাব—তোমার ভাল করবো—তোমার ভাল অইবো!

মৌলানা : পাঁচ সিকা আনা অইচে তো!

বৃদ্ধা : এই নাও সাব, ওষুধ কবজ—ভাল জিনিষ দিও।

বিদ্যুৎ : কি প্রদীপবাবু, দেখেছেন কি—মাদুলিতে যক্ষা সারে—সারে বৈকি দ্রব্যগুণ আছে তো! (অন্যমনস্ক)

প্রদীপ : হয়তো একটা ভাঙ্গা বস্তিতে তরুণী স্ত্রী নিয়ে—এর ছেলেটি অসুস্থ—হয়তো কত বদ লোক আছে সেখানে, হয়তো কত কি কাণ্ড হয় সেখানে—হয়তো ছেলেটির চাকরি আর নেই—

বিদ্যুৎ : 'হয়তো' নয়, হয়েছে তার চেয়েও অনেক মর্ম্মান্তিক অবস্থা আর তার ব্যবস্থার জন্য আছে হিন্দু-সৎকারসমিতি, সরকার আর আপনারা! ঐ তো বুড়ি মাদুলি নিয়ে চলে গেল—

বিদ্যুৎ : ছেলেটি মরলেই বুড়ি পাগলি হবে আর লোকটার স্ত্রী···থাক তারপর—তার—[কাছে জনতা চিৎকার করে উঠলো— : গেল গেল আহা আ লোকটা গেল!] [১ম ও ২য় লোকের প্রবেশ]

বিদ্যুৎ : কি হলো! কি হলো!

প্রদীপ : সেই চোরটা বাস চাপা পড়েছে—ওঃ একেবারে থেত্‌লে গেছে—

১ম লোক : পুলিশের হাত থেকে ছুট মেড়ে ছিল—

প্রদীপ : লোকটাকে আমি চিনতাম বিদ্যুৎবাবু—

বিদ্যুৎ : চিনতেন !

প্রদীপ : হ্যাঁ, পাকিস্তান থেকে ভিসা পাসপোর্ট ছাড়া পালিয়ে ইণ্ডিয়ায় এসেছিল ; পেটের জ্বালা বড় জ্বালা ! থানায় যেতে ভয়, পাছে পাকিস্তানী চর অপবাদে ধরা পড়ে যায়। কিন্তু এখন এমন ধরাই পড়লো আহা—

[জনতার মধ্যে হা হুতাশ শোনা গেল]

১ম লোক : আহা বেচারা !

২য় লোক : ছুটো দেশ হয়ে মানুষের কি জ্বালাই না হয়েছে !

১ম লোক : ইস্ কি রক্ত দেখছেন—!

২য় লোক : তাজা খুন—ই আল্লা—মেহেরবান—!

বিদ্যুৎ : জনতা অন্ধ নয়, কবন্ধও নয় প্রদীপবাবু, জনতা নির্বান্ধব !

[দূরে আজানের ডাক শোনা গেল]

প্রদীপ : চলুন, ঐ চায়ের দোকানটায় বসি গিয়ে—মন আর দেহ দুই-ই ক্লান্ত মনে হচ্ছে—ও হোয়াট এ-স্যাড্ ইন্‌সিডেন্ট ! [এগিয়ে গেল]

বিদ্যুৎ : য পলায়তি স···না···

প্রদীপ : কি বলো—?

বিদ্যুৎ : কিছু না, চলুন···(অন্যমনস্ক ভাবে) লোকটা কি বলছিল, 'ছুটো দেশ হয়ে'···ছুটো দেশ···খণ্ডিত ভারত···রক্তাক্ত বঙ্গ···রক্তাক্ত···

[আরও অন্যমনস্ক হয়ে এগিয়ে গেল]

দৃশ্যান্তর

প্রথম অঙ্ক : ২য় দৃশ্য

[শহরতলী। একটা চায়ের দোকান। এলাকাটা আগে মুসলমানদের ছিল, তার চিহ্ন এখনও এখানে ওখানে ছড়ানো রয়েছে। চা ঘরটি একটি ভগ্ন মসজিদের বারান্দায় সাময়িক ক্যাসানে অবস্থিত। সকাল আন্দাজ আটটা হবে। গুটিকয় যুবক খবরের কাগজ পড়ছে ও চা পান করছে। চা তৈরীর স্থানটী দৃশ্যের বাইরে।]

রমেন : দিনুদা একটা ডবল হাপ্ চা কর দেখি।

দিনু (দোকানদার) : তা' তো করবো দাদা, কিন্তু ওদিকে পাওনাটা কি গার্ব্ হয়ে যাবে নাকি ?

রমেন : (কাগজ ফেলেদিয়ে) আঃ, আঃ দিলে তো সব নষ্ট করে, সারাটা দিন আজ তাগাদা···হায়, অর্থ গৃধ্নু, তোমার ধমনীতে বিশ্বাসঘাতক শেঠ রক্তস্রোত, তুমি কি বুঝবে মর্ম্মের কথা···চেনো তো শুধু টাকা আর টাকা। (অন্য যুবককে লক্ষ্য করে) জানিস, এই যে দিনু গড়াই ছেঁড়া লুঙ্গী আর ফতুয়া, ট্যাঁকটা কি আন্দাজ ফাঁপা—ওর ঘরের মেঝের নীচে কতো মোহর কবর চাপা। খালি টাকা আর টাকা। যাও নিয়ে নিও শনিবারে। চা দাও।

হিমাদ্রি : (কাগজ পড়তে পড়তে)—কাশ্মীর হামারা হ্যায়, খালের জল চাই—শা—এসো না বর্ডার ডিঙিয়ে—পেঁদিয়ে বাপজানকা নাম ভুলিয়ে দেবো।

রমেন : কিরে শিখর হিমাদ্রি, কি হলো তোর—সেবক স্বয়ং, চায় একেবারে গেছিস—গোমাতাকী জয়—যতসব গরুর দল।

হিমাদ্রি : দেখ্ রমেন, মেলা বকবি না, কি বুঝিস বল্তো···খালি তো ইন্‌কিলাব আর ঝিংগা ভাজ। দেশকে তো চিনিস না, জানিস খালি বাব্বার দেশ।

রমেন : হিমা, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

হিমাদ্রি : কেন, কি··কি করবি রা ?

দীনু (নেপথ্যে) : এই হিম্ বাবু রমেন বাবু, বাইরে যান আপনাদের জ্বালায় দেখছি দোকান পাট গোটাতে হবে।

রমেন : তাই ওটাও না—ভারী আমার দোকান করেছো, মুসলমানদের মস্‌জিদটা ভেঙে বিনে ভাড়ায় বেড়ে ব্যবসা।

হিমাদ্রি : আলবাৎ করবে, একশোবার করবে···বর্ডারের ওপারে ওরা কি করছে !

রমেন : তাই বলে এখানে তার শোধ !

হিমাদ্রি : এখানটা কি--ইয়ে হিন্দুস্থান হ্যায়···তোরা কে-রা যা ভাগ্ ?

তখন কে ছিল এদেশে ? তৈমুর, চেঙ্গিস এসে কি করেছে ? কত মন্দির লুণ্ঠন, কত নারীর সতীত্ব নাশ, কত মানুষকে ধর্ম্মান্তরিত করে নি তারা—এদেশে অন্য ধর্ম্মের লোক এলো কোত্থেকে ?

রমেন : যেখান থেকেই আসুক, এখন তারা এদেশেরই লোক আর তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দিতেই হবে।

হিমাদ্রি : আর পাকিস্থানে হিন্দুদের 'আত্ম'বলে কিছু নেই, সবই পর ইস্,চারাম—গোলাম, গোলাম, তোরা সব পরের মুখে ঝাল খাওয়া-জীব, তোদের কি এমনিতে হুস হয়—মুগুর মারতে হবে।

রমেন : বটে! মুখ সামলে কথা বলবি হিমা, এক থাবড়ায় ঠাণ্ডা করে দেবো।

হিমাদ্রি : তাই নাকি! আয় না দেখি—আয়—আয়

[চেয়ার আঁকড়ে ধরে বিক্রম দেখাতে লাগলো]

দিনু (প্রবেশ) : আরে, আরে সত্যি সত্যি তোমরা উঠে পড়লে যে—থাম, থাম! [জনৈক সুবেশী লোকের প্রবেশ]

দিনু : আরে তারাদা যে, এমন সময়ে!

তারা : একবার বাইরে এসো, দরকারী কথা আছে।

দিনু : এই যাচ্ছি দাদা। [উভয়ের নেপথ্যে প্রস্থান]

[রমেন ও হিমাদ্রি দুইজনে দুই দিকে মুখ করে কাগজ পড়তে লাগলো।]

রমেন : সেই ষোড়েল চন্দর! চিনিস তো একে?

হিমাদ্রি : চিনি না আবার—সেই মার্কামারা রিফিউজি তো; ওদিকে পাকিস্থানের নাগরিক এ'দিকে এখানে বাস্তহারা এক সঙ্গে তিন চার জায়গায়। এ নাগাদ কম টাকা ফেঁদেছে নাকি গরমেণ্টের কাছ থেকে। আর ওদিকে প্রকৃত রিফিউজিরা তো হা-ভাত হা-ভাত করে মরছে!

রমেন : আর আমাদের দিনুদাটাও কম নয়, ক্ষুদে দানব···

হিমাদ্রি : হবে না, পড়ো মসজিদ—যত সব অপদেবতার আড্ডা!

[উভয়ে মুখোমুখী হয়ে বসলো]

রমেন : দেখ্ দোকানটা তুলে দিতে হ'বে···জেনে শুনে এমন সমাজ বিরোধী ঘাটি রাখা ঠিক নয়।

হিমাদ্রি : আজ্ঞে ব্রাদার, ও পাশের বিড়ির দোকানী ওৎ পেতে আছে জানো তো, পেটে পেটে এরা মাসতুতো ভাই। হ্যালো, প্রদীপদা যে!

[সুশ্রী স্বাস্থ্যবান জনৈক যুবকের প্রবেশ]

প্রদীপ : আরে হিমাদ্রি বাবুও আছেন দেখছি। তারপর রমেন কি খবর, তোমার বাড়ী থেকেই আসছি।

রমেন : বসুন চা খান এই দিনুদা, কোথা গেলে—খদ্দের বসে আছে যে !

দিনু (নেপথ্যে) : এই যে যাচ্ছি ভাই (প্রবেশ) এই যে প্রদীপবাবু আসছেন ভালই হল। দেখেন, রমেন বাবু আর হিমাদ্রি বাবু আবার যুদ্ধ শুরু করেছেন।

[হিমাদ্রী আবার ঘুরে বসলো]

প্রদীপ : তার আমি কি করবো বলুন—ওদের সময় আছে, গরজ আছে প্রচুর ; যা খুশী তাই করছেন। আমি—আপনি কি করতে পারি—কি বলেন হিমাদ্রি বাবু ?

হিমাদ্রি : কি আর বলবো সব তো আপনারাই বলবেন।

প্রদীপ : এই তো চটছেন মিছিমিছি···বলুন আপনার উপর কোন দিক থেকে কটাক্ষ করেছি আমি ? বরং কি মনে হয় জানেন—মনে হয় আপনাদের মতো নিষ্ঠাবান কর্মী যদি আমরা পেতাম—

[দিনু চা এনে দিল, চা খেতে খেতে প্রদীপ বল]

তারপর রমেন, তোমার কোটাতো এখনও ফিল্‌আপ্‌ হলো না—কি ব্যাপার ?

দিনু : তারাদা, দাঁড়াও দাদা যাচ্ছি। (প্রস্থান)

রমেন : ও কথা পরে বলছি। কিন্তু তোমার সঙ্গে খুব জরুরী কথা আছে প্রদীপদা—এই যে দিনুদা, তারা সেন···আচ্ছা চল বাইরে বলছি···এর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে···ইউ সুড নট টলারেট এনি মোর্‌ !

[নেপথ্যে একটী ১৪।১৫ বছরের মেয়ের কেত্‌লি হাতে প্রবেশ।
বেশভূষা অতি সাধারণ নাম চম্পা···সবারই প্রায় চেনা।]

নেপথ্যে চম্পা : দিনুদা কোথায় ?

জনৈক : ঐ তো ওখানে—ও দিনু দা [দিনু ও তারা সেনের প্রবেশ]

প্রদীপ : চল রমেন, [পকেটে হাত দিল]

রমেন : থাক্‌। দিনুদা, এক সঙ্গেই দেব, চল।

[রমেন প্রদীপ প্রভৃতির প্রস্থান]

দিনু : হ্যাঁ, হ্যাঁ···উঃ বাবা এটা যেন বৈঠকখানা [হিমাদ্রিও উঠ্‌লো] আরে না, নাঃ তোমাকে নয় তোমাকে না।—

হিমাদ্রি : সে জানি, তবে যেতে হবে এখন। [প্রস্থান]

দিনু : কাটো, কাটো।···আরে চম্পাকলি যে, বাবা কেমন ?

তারা : সেই মেয়েটি না ? [দিনুর সঙ্গে চোখের ইসারা দিনুর নেপথ্যে গমন]

[নেপথ্যে কথা]

মেয়েটি : আমার সে কথা মনে আছে তো ?

দিনু : আছে আছে তোমার কথা কি ভুলি।

দিনু : [প্রবেশান্তে] আচ্ছা এখন এসো। ও কথা ঠিক মনে আছে।

তারা : কোন কথা হে ? সেই চাকরি—হাঃ হাঃ আরে, দলে টানো না কেন ইয়ার !

দিনু : অ অমনি ! কোথায় কে অভাবে দুরবস্থায় পড়লো—আর অমনি সেখানে তোমাদের থাবা গিয়ে পড়লো···হরি হে দীনবন্ধু ! দারিদ্র্যের সুযোগ নিতে এতটুকু বাঁধে না তোমাদের। হরি হে—দীনবন্ধু···!

তারা : এইরে তুমিও নীতি কথা শুরু করলে···ভূতের মুখে রামনাম মানায় না দিনুনাথ ! আর অভাব—দেখ, অভাব এমনি হয় না···মানুষ অভাব সৃষ্টি করে ; পাপে করে, গরজে করে, আর তার জন্য দুর্ভোগ তো ভুগতে হবেই— আমরাতো নিমিত্ত মাত্র। থাক ও সব শাস্ত্র বচন, এবার তরী ভেড়াও তো ভায়া !

দিনু : ভেড়াও বললেই কি আর ভেড়ান যায় দাদা···গভীর জলের মাছ, ···আজ না হয় বস্তিতে এসেছে···দেশে অবস্থা ভাল ছিল, খেতাবও ভাল "রায়"। যাক্ ও সব কথা, ও দিকের খবর কি, কিছু মালকড়ি খসাও দেখি, না একলাই সাটবে।

তারা : রামচন্দ্র কও···তোমাকে বঞ্চিত করে ? এই নাও [নোটের তাড়া গুজে দিল] দু'শো আছে, কদিন পরে আরও কিছু ব্যবস্থা করছি কিন্তু সে সাক্ষী দু'টোর কি হল ? আজই যে কেস্।

দিনু : নির্ভাবনায় থাক···একটু বাদেই এসে পড়বে···এলেই পাঠিয়ে দেব···কাল রেস গেছে তো। বোধ হয় ঘায়েল হয়েছে, নইলে এতো বেলাতো হয় না !

তারা : আর সেই রিফিউজি লোনের জন্য বাড়ীওয়ালার দু'টো ভাল সার্টিফিকেট আর কি নাম বল্লে চম্পাকলি—

দিনু : আরে তুমি যে এরই মধ্যে গলে জল, আরে দাঁড়াও দাঁড়াও সবুরে মেওয়া ফলে।

[প্রদীপ ও রমেন আবার ঢুকলো এবং তারা সেনকে মনযোগ দিয়ে দেখে নিল]

দিনু : কি গো আবারও চা চাই নাকি ?

রমেন : না কিছু চাই না। তোমার পাওনাটা শনিবার নাগাদ পেতে পার তাই জানাতে এলাম। আচ্ছা চলি। চল প্রদীপদা—(উভয়ের প্রস্থান)

দিনু : কিছু চাই না। তোমরা হাঁট ডালে ডালে আর আমি হাঁটি পাতায় পাতায়, আমি চিনি না তোমাদের! তারাদা, তোমার তো পুলিশের সঙ্গে ব্যবস্থা করা আছে···এদের নামে একটা ফলস্ কেস ঝুলিয়ে দাও দেখি ···রমেনটাকে ফটকে ঢোকাতে না পারলে বুঝতে পারছো ?···

জুয়ার আড্ডা, রেস্ আমাদের এ সব গয়া হবে···কাজেই আর দেরী করো না। এমনিতেই পলিটিক্যাল আসামী রমেন···চল সব বলি ভাল করে। ওদিকে চল।

[নেপথ্যে নারী কণ্ঠে চিৎকার: তবে রে মর্দা বদমাস বেটা আজ তোর একদিন কি আমার একদিন—আয় দেখি ?]

তারা : ও আবার কি ?

দিনু : পথের কলে জলরঙ্গ···এত ভঙ্গ বঙ্গ দেখে তবু রঙ্গে ভরা। চল, চল দেখি কি হলো আবার।

দৃশ্যান্তর

প্রথম অঙ্ক : তৃতীয় দৃশ্য

[পশ্চিমবঙ্গের একটি পাড়াগাঁয়ের রেলষ্টেশনের নিকটবর্তী রাস্তার মোড়। কয়েকটা ঝাঁকড়াগাছের ছায়া, অদূরে ষ্টেশনের নানারকম শব্দ। একটি গাছের গুঁড়ির উপর বসে শুটিকয় রোগা ছেলে আখ্ চুষছে। তিন চারজন লোক কাঁধে বাঁক ঝুলিয়ে এসে দাঁড়াল। তেল চুকচুকে মাথায় গামছা বাঁধা, বাঁকে পেতলের কলসিতে দুধ। এদের হাঁটার ধরণ নাচের মত। বিশ্রাম করতে এসে দাঁড়াল' বসলো না। ছেলে কয়টি উঠে দাঁড়ালো ভক্তিভরে প্রণাম করলো···দু-চারজন পথচারী এলো তারাও প্রণাম জানাল বাঁকের উদ্দেশ্যে।]

সকলে : জয় বাবা তারক নাথের জয়। [প্রদীপের প্রবেশ]

প্রদীপ : কোথা থেকে আসা হচ্ছে ভায়া !

দুধওয়ালা : কোল্‌কাতা...বড়বাজার।

প্রদীপ : তা দুধ বয়ে—সেজেগুজে তোমরা চললে কোথায় ?

জনৈক লোক : যাত্তি হবে বাবা তারকনাথের থানে।

প্রদীপ : সেখানে কি ?...

লোক : বাবার থানে মানত ছিল কিতবর শেঠজীর—

প্রদীপ : অ, তা শুনেছি তো বাবার কাছে নিজেকেই যেতে হয়, হত্তে দিতে হয়—এভাবে—

লোক : সব ব্যবস্থাই আছে বাবু···বড় লোক মানুষ, বাবার নামে মান্‌সি করেন, আমরা গরীবরা দুইডা পয়সা পাই।

প্রদীপ : বাঃ চুরি জোচ্চুরি করে এত সহজে পাপ ক্ষালন হলে মন্দ কি! যাদের রক্ত শোষণ করছে তারাও শ্রমিক, আবার সেই পাপ ক্ষালনের জন্য যারা দুধ বয়ে নিয়ে যায় তারাও শ্রমিক—সত্যি বিচিত্র এই দেশ। হায়রে সভ্যতা! হায়রে ধর্ম!

লোক : ও সব আপনি বুঝবেন না, কলকাতার বাবু তো···মাড়োয়ারীদের তবু ধর্ম বলে জিনিষ আছে, আপনাদের কিছুই নেই।

প্রদীপ : সব হবে সব হবে এই তো এলাম বাবা, তা সজনীগড়টা কোনদিকে বলতে পার ?

লোক : এ পথে নয় বাবু, ইষ্টিশানের ওই দিকে, ঐদিক দিয়ে যান··· ঐ যে খালডা দেখছেন, ওর ধার দিয়ে পথ।

বাঁকের লোকেরা সমস্বরে : বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগে··· মহাদেব···জয় শিব শঙ্কর ভোলানাথ কি জয়।

(পথিকদের উদ্দেশ্যে প্রণাম)

প্রদীপ : কুসংস্কারকে এরা কি ভাবে অঙ্গের ভূষণ করে নিয়েছে,···এ ভূত ছাড়ানো কি সহজ কথা। Religion is opium to the people.

[নতুন পথিক এলো এবং বাঁকের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে চলে গেলো।] সত্যি কি বিচিত্র এই দেশ সেলুকাস! [বিপরীত দিকে লক্ষ্য] আরে আরে বিদ্যুৎ বাবু যে, কি ব্যাপার ?

[বিদ্যুতের প্রবেশ]

বিদ্যুৎ : কলকাতা থেকে আসছি, যাব মুরারীপুর—

প্রদীপ : হঠাৎ।

বিদ্যুৎ : কাকাবাবুর বাসা ওদিকে, বড় দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে যাচ্ছি প্রদীপবাবু। খবর এসেছে পাকিস্তান থেকে।

প্রদীপ : কি খবর ?

বিদ্যুৎ : পাকিস্তান গিয়ে কাকাবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, গত শনিবার রাত্রে মারা গেছেন ! (থেমে) বর্ডারের পাঁচিল ডিঙিয়ে তিনি যে রসদ পাঠাতেন তারই উপর নির্ভর করত এখানকার সংসার···(আবার একটু থেমে) দুটি বয়স্কা মেয়ে বিয়ে দিতে হবে···দুটি ছেলে উপার্জনের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত প্রদীপবাবু, কাকীমাকে এ দুঃসংবাদ দেবো কি করে বলতে পারেন ?

প্রদীপ : যে করেই হোক সংবাদ তো দিতেই হবে। তা কতদূর মুরারীপুর ?

বিদ্যুৎ : তা সামান্য পথ। জায়গা কিনেছিলেন কাকাবাবু, এবার দেশ থেকে এসে বাড়ী করবেন, এ রকম ছিল আশা। নির্বান্ধব প্রায় পোড়ো বাড়ীতে কি ব্যাকুল নিষ্ফল আর্তনাদ করে তাঁকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছে ! প্রদীপবাবু, এ মরণ কি শ্যাম সমান ? শুধু কি এই ! কাকীমার এক ভাই পলিটিক্যাল আসামী হয়ে ও দেশের জেলে আত্মহত্যা করে মরেছে, স্লোপয়জনিং করে তাকে মারবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। ভাবতে পারেন লৌহ কপাটের আড়ালে একটি আদর্শবাদী তরুণ কিভাবে মৃত্যুকে বরণ করেছে। এ মরণ কি শ্যাম সমান ? বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে প্রদীপ বাবু, বাতাসের আগুনের ছন্দ এখনও কি এ বাতাসে সাইক্লোন হবে না ?

প্রদীপ : সম্ভবত এখনও সময় হয়নি।

বিদ্যুৎ : সম্ভবত শক্তি প্রয়োগের সে শক্তি নেই আপনাদের···মনে হয় ও পথে ক্রান্তি ঘটবে না। মনে হয় আপনি এসেছেন গাঁয়ের পার্টির কাজ করতে, এখানে পার্টির ফ্রন্ট জোরদার করতে।

প্রদীপ : অনুমান আপনার একেবারে মিথ্যা নয়।

বিদ্যুৎ : কিন্তু আখেরে কি হবে এতে ?

প্রদীপ : আপনার অনুসন্ধিৎসা রিএ্যাক্শনারি···

বিদ্যুৎ : হয়তো আপনাদের কর্মধারা আরও বেশী প্রতিক্রিয়াশীল···যাক্ কিন্তু আমি এখন কি করি। এই যে মানিক এসেছ···[একজন ২০।২১ বৎসরের যুবকের প্রবেশ]

মানিক : বিদ্দা ! কি খবর—বাবার কিছু খবর পেলেন ?

বিদ্যুৎ : পেয়েছি ভাই, কাকাবাবুর অবস্থা···অবস্থা খুবই খারাপ, খু···

মানিক : কিন্তু এতো তেলখড় পুড়িয়েও আসছে সপ্তাহের আগে কিছুতেই ভিসা পাওয়া যাবে না···। বড়দি তো আসাম, তাকে তার করাও যা না করা ও তাই।···মাঝে সেই প্রাচীর—পাসপোর্ট চাই, ভিসা দরকার···কে যাবে সেখানে·· কিন্তু—

বিদ্যুৎ : থেমে গেলে তো?—উপায় খুঁজে পেলে না তো? কিন্তু রাষ্ট্র ধুরন্ধরেরা ঠিক খুঁজে পেয়েছে! দেশটাকে কেটে কুটে গদীর উপর চেপে বসেছে।

মানিক : কিন্তু দাদা ভগবান না করুন, এই অবস্থায় বাবার যদি একটা কিছু হয়—

বিদ্যুৎ : কি আর করবে—ভাই, অনেকের আত্মীয়-স্বজনেরই ঐ অবস্থা হয়েছে। তাই বলে ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না।

মানিক : কিছু খবর পেয়েছেন নাকি···কেউ এসেছে না কি···কে এসেছে?

বিদ্যুৎ : মুমতাজ খাঁর কারখানার লোক এসেছে সেই বোললো···বল্ল বল্ল—

মানিক : বিদ্‌দা···

বিদ্যুৎ : বল্ল···কাকাবাবুর অবস্থা খুব খারাপ হয়ে···শনিবার রাত্রে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

মানিক : [হঠাৎ গুম হয়ে গেল, একটু পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্‌ল] বাবা নেই—তা' হলে [একটু থেমে] বাঃ বেশ হলো—ভালই হল··· সব ঠিক হলো—ঠিক হলো—বাঃ, বাঃ—

বিদ্যুৎ : [মানিককে ধরে ফেল্‌লো] মানিক!

মানিক : বিদ্···দা···[কান্নায় ভেঙে পড়ে] বাবা···নেই, বাবা নেই [কান্না] বাবা—

বিদ্যুৎ : অভিশাপ···অভিশাপ ভাই···বংশই আমাদের অভিশপ্ত। বংশানুক্রমে সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত সুরু হয়েছে সেই' ৪৬ সাল থেকে। চোখ মুছে ফেল মানিক, এবার নূতন করে যাত্রা শুরু করতে হবে···নতুন দিনের ভাবনাকে গ্রহণ করতে হবে!

প্রদীপ : ক্রমেই কবিতার ভাষায় চলে যাচ্ছেন বিদ্যুৎবাবু!

বিদ্যুৎ : জীবনের অমোঘ উপলব্ধিই কবিতা—বন্দেমাতরম্ আমাদের জাতীয়তার জীয়নকাঠি। চল মানিক সামনে চল···চল। [উভয়ের প্রস্থান]

প্রদীপ : বুর্জোয়া···সো ক্যালাস্ দে আর। পূর্ববঙ্গের একটা উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবার আজ কোথায় তলিয়ে যেতে বসেছে—তবু কি হুঁস্ আছে এদের—

[পকেট থেকে সিগারেট বের করলো এবং অগ্নিসংযোগ করে প্রস্থান]

বাইরে : "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" ধ্বনি।

দৃশ্যান্তর

প্রথম অঙ্ক : চতুর্থ দৃশ্য

[মজা নদীর তীরে বিদ্যুৎ, মানিক ও আরও ক'জন যুবক বসে আছে। অদূরে শ্মশান জ্বলছে, তার রক্ত-আভা এসে পড়ছে এদের মুখে। এরা এসেছে মরা পোড়াতে।]

মানিক : সব শেষ হয়ে গেল!

বিদ্যুৎ : শেষ! চিতায় যদি জীবনের শেষ হতো তা হলে পৃথিবী অনেক আগেই থেমে যেত মানিক···শেষ নয় ভাই—শুরু। (একটু থেমে) আগেকার দিন হলে দল বেঁধে এঁয়োতিরা আসতো সতীলক্ষ্মীর পদধূলি নিতে—স্বামীর মৃত্যু খবর পেয়ে যে নারী জীবন অর্থহীন মনে করে সঙ্গে সঙ্গে পরপারে চলে যান তাঁর মত স্বামী-অন্তঃ···কাকীমা প্রণাম। (উদ্দেশ্যে প্রণাম)

মানিক : কিন্তু এমন নাটকে পার্ট করতে আর মন চাইছে না বিদ্দা।

বিদ্যুৎ : তবে কি করবে, গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হবে? সে এক্সপেরিমেণ্ট তো হয়ে গেছে, আর কেন!

মানিক : কিন্তু এ জীবন এ যেন অন্ধ স্রোত, কি আছে আর ধরবার মত—কিছুই যে নেই দাদা, ছল্ ছল্ খল্ খল্ করে ভেঙে চুরে কোথায় সব মিলিয়ে যাচ্ছে কিছুই তো ধরতে পারছি না—দাঁড়াবো কোথায়!

বিদ্যুৎ : পাগল, দাঁড়াবো কোথায়—সে ভাবনা কি তোমার—কোথায় দাঁড়াবো করে করে যেখানে দাঁড়িয়ে আছ—সেখানে থেকেই কাজ করতে হবে ভাই। অনেক কালের বন্ধ্যাদশার শেষ হয়েছে কিনা—তাই এতো ধ্বংসের তাণ্ডব—ভয় পেলে কি চলে ভাই—ছিঃ

মানিক : কিন্তু দাদা, সত্যি করে ভেবে দেখ কি আছে আমাদের! কোথায় যাব আমরা বলতে পার?

বিদ্যুৎ : 'সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননী রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি'—কবির এ আকূতি শুনতে পেয়েছেন বঙ্গমাতা—তাই তো এমন গৃহহীন ছন্নছাড়া হতে হলো ভাই—নবযুগের ক্রান্তি আমাদের পায়ের বেগে ঘটাতে হবে মানিক!

সত্যজিৎ (জনৈক যুবক) : কিন্তু নেতা কোথায় যিনি পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থায় পথ দেখিয়ে চলবেন···এই তো '৫১ শেষ হতে চল্ল।

···যার বাণী লাগি' আমরা কান পেতে ছিলাম, কৈ সফল হলো না তো!

বিদ্যুৎ : সত্যজিৎ ভুল করছো ভাই, স্বয়ং ভগবান অসুর বিনাশ করতে এসে কতবার প্রতিহত হয়েছিলেন—মহাশক্তি দুর্গাও মহিষাসুর নিধন করতে এসে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করে গেছেন। সব শক্তিই ভগবানের···তার কাজই সবাই করে চলে লোকে লোকে···যত বাধা ঘটবে তত শক্তিময়ের ভাব বৈভব আসবে আসবেই—ভগবানের কাজ স্থূলে যখনি ঘটে সূক্ষ্ম জগতে ঘটে তার অনেক আগে। বাইরের ঘটনা পর্য্যায় দেখে সব সময়ে প্রকৃত কাজের সন্ধান পাওয়া যায় না ভাই। ভগবানের যা বিধান তা দেরী হলেও সুনিশ্চিত অমোঘ।

সত্যজিৎ : তা হলে এ দেশ ভাগ অসুরের খেলা?

বিদ্যুৎ : নিঃসন্দেহে। প্রগতির বিরুদ্ধতম শক্তি দেশভাগ ঘটিয়েছে—শুধু এ দেশে নয় আরও অনেক দেশে। আর "কুরুক্ষেত্রে" তার পরাভব অবশ্যম্ভাবী—কিন্তু তার জন্য প্রস্তুতি চাই ভাই! যুধিষ্ঠিরের সত্য, ভীমের পরাক্রম, অর্জুনের শরসন্ধান, ধৈর্য্য, নকুল সহদেবের আনুগত্য জাতের অন্তরে আমাদের জীবনে যোজিত হলেই অসুর শক্তির রূপান্তর ঘটবে। কিন্তু ভেবে দেখ, আমরা কি সত্যি প্রস্তুত?

সত্যজিৎ : তা হলে, তা হলে—

বিদ্যুৎ : প্রস্তুতি চাই, চাই সাধনা···দেশ ভাগ তিরোহিত অখণ্ড রাষ্ট্রই আমাদের প্রধান লক্ষ্য নয়···অতিমানস আসল লক্ষ্য। লক্ষ্য ঠিক থাকলে আর এসব ঘটে যাবে অতি সাধারণ ভাবে। জানতো শ্রীকৃষ্ণ শুধু কুরুক্ষেত্র বিজয়ের জন্যই আসেন নি—এসেছিলেন এক নবতম সত্য ও বোধিকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করতে। তাই তো তিনি বলে গেছেন—সর্বধর্ম পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ!

[মানিকের তরুণী বোন আত্রেয়ীর আলুথালু বেশে প্রবেশ]

আত্রেয়ী : [কাপড়ের আঁচলে মুখ চাপা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে]

মা, ও দাদা, মাকে তোমরা ছাই করে ফেললে—শুধু ছাই ! [কান্না]

বিদ্যুৎ : (উঠে আত্রেয়ীকে ধরে ফেলো) আত্রেয়ী, শোন, আয়, এদিকে—শোন—কাঁদিস নে !

আত্রেয়ী : কি শুনবো—আজ সব আশা ছাই হয়ে গেলো—শুধু ছাই ! উঃ মাগো (কান্না)

মানিক : থাম আত্রেয়ী—কাঁদলে কি আর হবে—সব ভগবানের খেলা।

আত্রেয়ী : ভগবানের খেলা !—কে ভগবান, কেমন ভগবান—আসুক না আমার সামনে ! ইঃ খুব মজা যা খুশী তাই করবেন আর আমরা মেনে নেবো ! কেন মেনে নেবো—অতই কি খেলার পুতুল আমরা ?

বিদ্যুৎ : একেবারে ডিস্‌ব্যালেন্স হয়ে পড়েছে—ওকে ধরে বাড়ী নিয়ে যাও ··কি করে এলো এদিকে !

আত্রেয়ী : না না ছেড়ে দাও আমাকে, ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও, আমি ঐ আগুনে ঝাঁপিয়ে পুড়ে মরবো, দেখব কেমন তোমাদের ভগবান—তার মুখোমুখী হয়ে কটা কথার জবাব চেয়ে নেবো। ছেলেখেলা পেয়েছে—যা খুশী তাই করবে—দুঃখ আলা ব্যাধি মৃত্যু দিয়ে চিরকালের মত আমাদের পঙ্গু করে রাখবে···না না ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—

বিদ্যুৎ : এই বিদ্রোহকণ্ঠ চিরকাল রাখতে পারবে বোন ? পারবে আত্মিক গঠনে এই জিজ্ঞাসা ?

আত্রেয়ী : (বড় বড় করে তাকালো) পা—র—বো !

বিদ্যুৎ : তাহলে তোমার সব প্রশ্নের জবাব তুমি জীবনেই পাবে···মৃত্যু জয়ের শক্তি যদি সঞ্চয় করতে পার—মৃত্যু এসে মরবে তোমার কাছে। জয় তোমার হবেই কিন্তু খবরদার, সংকল্পে বিচ্যুতি, সাধনায় বিঘ্ন চিরকালের বন্ধ্যাত্ব ডেকে আনবে···সে বড় ভয়াবহ।

আত্রেয়ী : কিন্তু বিদ্‌দা—মা যে একেবারে ছাই হয়ে গেলেন—কিছুই তো আর রইলো না।

বিদ্যুৎ : কেন তুমি মানিক এরা তো রইলে তাঁর হয়ে। জীবনটা কি, কি এ জীবন ? সাধারণ মানুষের পক্ষে কিছু বাসনা কামনার আধার ভিন্ন আর কি ! আসল জীবন কি—কে তা শোনে, কে তা বোঝে ? কাঁদে কেন,

ভোগে কেন, মরে কেন···বেঁচেই বা আছে কেন—ভাবে কখনও ? আর ভেবে সত্যিকারের বাঁচা বাঁচতে পারে, না চায় ? জন্ম যেমন অদ্ভুত, মৃত্যুও তেমনি অকস্মাৎ—। মাঝের যে টুকু তাও মহাকালের নিঃশ্বাসে কোথায় সুপ্ত।

আত্রেয়ী : তাহলে তাহলে—

বিদ্যুৎ : পথ আছে—ভারতবর্ষ তো সেই জন্যেই—তার সনাতন ধর্ম তো সে প্রয়োজনেই। ধৈর্য্য ধর বোন, অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর খবরটি মনে রেখে বিশ্লেষণ করে দেখ তোমার বাসনার স্বরূপ—প্রত্যক্ষ কর তোমার আত্মরূপ —তারপর বাসনার উর্দ্ধে আত্মার কর সন্ধান। দুঃখ আধি ব্যাধি এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত বিদূরিত হয়ে যাবে। ঐ যে আগুন, ঐ আগুনের হুঙ্কারের সামনে দাঁড়িয়ে সংকল্প কর নতুন জীবনের। যে আগুনে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িকতা, মিথ্যা অন্যায়—সমস্ত পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাক—।

লোহিত : কিন্তু এতো সব স্বপ্ন তোমার ব্যক্তিগত জীবনে কতটা সফল হয়েছে বন্ধু ?

বিদ্যুৎ : আমি তো বলিনি, আমি কায়মনবাক্যে সেই জীবনের পথিক হতে পেরেছি···তবে হতে পারবো না এতো ভাবতে পারি না। আর ব্যক্তিগত ভাবে যদি আমি ব্যর্থও হয়ে যাই তবু আশা করবো, আর কেউ অবশ্যই হবে। নিজের মিথ্যাচারে অক্ষমতায় ব্যর্থ হলে শাশ্বত সূর্য-প্রত্যয়কে অবিশ্বাস করবো কেন !

লোহিত : যতদিন বেঁচে আছি তাই সুন্দর ভাবে উপভোগ করতে পারছিনা তো অত সব কথায় কাজ কি ?

বিদ্যুৎ : কিন্তু মৃত্যুকে আমরা কেন মেনে নেব চিরকাল ?—প্রগতির কথা যদি বল—তবে সঠিক প্রগতি ঘটাতে হবে তাই—নইলে কিসের ধনতন্ত্র কিসের সমাজতন্ত্র—কিসের প্রগতি ! জীবন হবে মৃত্যু উত্তীর্ণ দুঃখহীন পূর্ণতম জীবন এবং এই পৃথিবীতেই—তবেই বলি প্রগতি !

আত্রেয়ী : হাঁা তাই তাই চাই।—মানুষ হবে স্বয়ং সম্পূর্ণ—আধিব্যাধি দুঃখহীন অনন্ত জীবনের অধিকারী···সে নিজেই হবে নিজের ভগবান···তাই চাই···কিন্তু মা যে শেষ হয়ে গেলেন !

নেপথ্যে জনৈক : মানিক এদিকে এসো—চিতায় জল দিতে হবে—

(মানিক চলে গেলো)

বিদ্যুৎ : অবিচল স্থির চিত্তে সেই শক্তিকে ডাক বোন ! শ্মশান থেকে আমাদের শুরু হলো···১৯০৫ সালের বঙ্গ ভঙ্গের আগুনের ঝলক ঐ আগুনে রয়েছে—এর ঝলকে সারা দেশ শুদ্ধ হয়ে যাবে।

আত্রেয়ী : কিন্তু দাদা আমার বড় ভয় করছে, বড় ভয়···কাল রাত্রে বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

বিদ্যুৎ : কাল শুধু স্বপ্ন দেখনি—এখন যা দেখেছ তাও স্বপ্ন। এক অর্থে তোমার জন্ম স্বপ্ন, জীবন স্বপ্ন···মৃত্যুও স্বপ্ন কিন্তু যে সত্তা স্বপ্ন দেখছ, সেই আত্মসত্তাকে চেন বোন···সম্পূর্ণভাবে তাই হয়ে ওঠ···চল আমরা সেই সাধনাই করি। সেই সাধনারই এক ধারায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হয়··· বন্দেমাতরম্ সেই সাধনারই বাণী। জাতীয় জীবনের মূল সুরটি প্রতিধ্বনিত করতে হবে সবার অন্তরে। ভারতবর্ষ···তার সনাতন ধর্মকে নতুন করে মর্যাদা দিতে হবে।

নেপথ্যে (বহুকণ্ঠে) : ইনক্লাব—জিন্দাবাদ, আমাদের দাবী মানতে হবে···নইলে গদী ছাড়তে হবে।

: বল হরি···হরি বল, বল হরি—হরি বল !

বিদ্যুৎ : যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছ দুই চীৎকারের মধ্যে তোমরা ? আমি কিন্তু পাচ্ছি···চল বোন এগিয়ে যাই···চরৈবেতি

[বিদ্যুৎ, আত্রেয়ী প্রভৃতির প্রস্থান]

লোহিত : সত্যি অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে বিদ্যুতের। প্রদীপ ঠিকই বলেছে, কলেজের সেই বিদ্যুৎ আর আজকের সন্ন্যাসী বিদ্যুৎ !

: দৃশ্যান্তর :

দ্বিতীয় অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য

[শিয়ালদহ ষ্টেশনের এক ধারে বাস্তহারারা পশুর মত অবস্থান করছে। হোগলার ছাওয়া নীচু নীচু আবাসস্থল। স্থানটি অত্যন্ত নোংরা। অর্দ্ধশায়িত বাস্তহারা প্রৌঢ় গগনমণ্ডল বিড়ি টানছে। অন্যান্য অনেকে যার যার কাজে ব্যস্ত।]

মাখন : যামু না, আর যামুনা আমরা—কি অইবো গিয়া, প্যাটে ভাত নাই, কাপড় নাই পরনে·· পথে পথে যাও আর চিল্লাও—"ইন্‌কিলাব—জিংগাবাজ"—

২টি শিশু : ইন্‌কিলাব জিংগাবাজ হিঃ হিঃ আমারে নিয়া যাইবা বাবা ?

মাখন : দূর থাম্ কইতাছি—হালার বাচ্চা পোলাবান্‌রাও শিখ্‌ছে—!

দলপতি (সর্দ্দার) : তোমরা হ'লে সংগ্রামী জনতা একদিন তোমাদের হাতেই রাষ্ট্রক্ষমতা আসবে—শিশুর মুখে ও বুলিতো আপার কথা মাখন !

গগন : মাখন তো আর এমনি গলে না সর্দ্দার ! বলি গলাও তো মাথাপিছু দুইডা কইরা টাহা···পাটি থিকা তো অনেক খিচা আন আমাগো বেলায় ২৫ নয়া পয়সা—চালাকির আর জায়গা পাইলা না !

দলপতি : চালাকি আমি করি না তোমরা কর ? এই তো সেদিন বলদের লড়িতে করে গিয়ে ছেলে মেয়ে নিয়ে সারা দিনরাত কাটিয়ে এলে কৈ কত টাকা পেলে—কেউ তো জানতেও পেল না আর ওদলে গেলেই বা কোন লজ্জায় !

গগন : যামু একশ'বার যামু···আমরা কি কারো কেনা চাকর নাকি ? শ্রমিক রাষ্ট্র না ছাই, যাও যাও আর যামু না আমরা—২৫ নয়া পয়সার নিগা চেঁচামুনা আর।

দলপতি : মাথা ঠাণ্ডা করে কথা কও গগন।

গগন : মাথা ফাটাইয়া ফালামু। আমার মাইডারে সেই যে নৈহাটী নিয়া গেলা—বলি শ্রমিক রাষ্ট্র তো গড়বা—বয়সের মাইডারে সেই কেডা নিয়া গেল খোঁজটা দিলা না···যাও যাও চিন্‌চি···সবাইরে চিন্‌চি···সোজা কথা, আমরা আর ভাড়া খাটুম না।

দলপতি : কত হাজার হাজার কৃষক, পুরুষ, মেয়েছেলে পর্য্যন্ত নিয়ে এসেছে গাঁয়ে দেশ থেকে পায়ে হেঁটে···এ্যাসেম্লী অভিযানে যাবে আর তোমরা এখানে থেকে যাবে না মাখন ?

গগন : অ-সব ফন্দিফিকির আমরা বুজি। গাঁয়ে ঘাশে খাইবার পায় না—টাহার লোভ দেখাইয়া ভাগো আনা যায়—কৃষক না হাতী।

সর্দার : মাথা গরম করো না গগন। [নেপথ্যে চেঁচামেচি]

গগন : মাতা গরম করুম না তবে কি বরফ করমু—অই দেহ সর্দ্দার অস্ত্র-গুনারে দেহ···ইয়ার থিকা মনের পশুও ভাল। সর্দার, এটা উবগার করতি পার···তোমার কাছে বিষ আচে—বিষ !

মাখন : ইস্ খালি নেতাগো মতন নেক্‌চার। ক্যান্ রেলের চাকা কি বন্ধ অইয়া গেছে ? বিষ···আরে মইরবার সাহস আচে ? খালি মুখেই লম্বা কতা !

প্রদীপ (প্রবেশ) : কি খবর তোমাদের···শোভাযাত্রায় যাবে না তোমরা আজ যে চরম সংগ্রামের দিন।

গগন : (উঠে এলো) হারামজাদা, হারাম—যামু না আমরা যামু না, আমরা সব ইষ্টাইক্ করচি হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ দুইডা কইরা টাহা···

দলপতি : তা—তা—

প্রদীপ : টাকা তো দেওয়া হয়েছে।

গগন : সে টাকা কি আমাগো কাচে আইবো···সব সব ওর প্যাটে যাইবো। তাছারা আর আমরা ভাড়া খাটুম্ না।

মাখন : না বাবু, আমরা যামু কিন্তুক টাকা চাই নগদ।

দলপতি : এদিকে আসুন স্যার সব বলছি।

[দলপতি ও প্রদীপের প্রস্থান]

[নেপথ্যে খোল করতাল ও বাদ্যসহ "বলহরি হরিবোল হরি" ধ্বনি। জনৈক কিশোরের প্রবেশ।]

কিশোর : (উচ্চস্বরে) খুব বড়লোক মরচে রে, অনেক পয়সা ছিটাইতাচে পতে, আরে তুমরা যাইবা নাকি ?

অনেকে : তাই নাকি চল চল "বলহরি বল হরি" (দৃশ্য ও নেপথ্য থেকে অনেকের উদ্দেশ্যে প্রস্থান) [শুধু মাখন ও গগন রইল]

মাখন : ইস্ নরকের কীট অইচে সবগুলা···ভিখারীরও অধম, মড়ার পয়সায় ভাত খাওয়া !

গগন : মাখন ?

মাখন : কি ?

গগন : এটা কাজ করমু (থেমে) আগুন লাগামু সব হোগলার ঘরে, পারবি পারবি এই জন্ত জানোয়ার গুলারে তাজা পুড়াইয়া মারতে ?

মাখন : পাগল অইচো তুমি···মাতা খারাপ অইচে তোমার।

গগন : বউডা বর্ডারে গেচে, মাইডা গেল ইহানে, ছাইলাডা জেলের ঘানি টানচে চুরির দায়ে ; মাথা আর ঠিক থাকবে কি কইরা কস্ না মাখন ইয়ার মধ্যে মাথা ঠিক রাখুম কি কইরা মাখন !

: দৃশ্যান্তর :

দ্বিতীয় অঙ্ক : দ্বিতীয় দৃশ্য

[ষ্টেশনের অন্যদিকে···কিছুটা নিরিবিলি। দলপতি-সর্দার' ও প্রদীপ।]

দলপতি : ওদের কথা ছেড়ে দিন স্যার···ওরা কি মানুষ, ওরা হলো সব পশু। পাঁঠার দল তাড়াতে দেখেছেন···ছাগল ভেড়া? থেকে থেকে খুঁটি ধরে দাঁড়াবে বৈকি তবে চাবুক কসলেই···

প্রদীপ : থামুন···ভাবতে দিন আমায়।

দলপতি : ভাববেন? ভাবুন কিন্তু নিখিলেশ বাবুরা বলেন···

প্রদীপ : থামুন, নিখিলেশবাবু নিখিলেশবাবু···

দলপতি : চটছেন কেন স্যার ওরা হচ্ছেন দলের মাথা! ওরাই এখন নির্বাচিত হাই কমাণ্ড।

প্রদীপ : পৃথিবী যেমন ঘোরে তেমনি অনেক কিছুই ঘোরে মশাই। দিনদিন পার্টির যা ভাব গতিক দেখছি তাতে আমাদেরই দল ছাড়তে হবে! এই সব মানুষদের ভাড়িয়ে···

দলপতি : তা যা বলেছেন···মানুষ না পশু।

প্রদীপ : জনতা সম্পদ। লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা হতে পারত জাতের এ্যাসেট আজ তারা আবর্জনার সামিল···আমরা তাদের ভাড়িয়ে গদীর দিকে ধাবমান।

দলপতি : কি হলো আপনার? আপনি ভাবুন···আমি আসি।

(প্রস্থান)

প্রদীপ : কত আশা নিয়ে পার্টিতে ঢুকেছিলাম···কিন্তু এখানেও সেই অন্যায়তা···ক্ষমতার লড়াই। ভোটের জোরে সত্য আজ পরিত্যক্ত···আজ আমরা পার্টিতে কোনঠাসা···পরাজিত। কে···আমায় কিছু বলবে?

(উদ্বাস্তু বালিকার প্রবেশ)

বালিকা : হ্যাঁ বাবু!

প্রদীপ : বল না, তবে সাহায্য টাহায্য করার সামর্থ আমার নেই।

বালিকা : আমিই কিছু সাহায্য করমু···

প্রদীপ : আপনি মানে তুমি সাহায্য চাওনা বরং সাহায্য করতে চাও!

বালিকা : হ্যাঁ [চারদিকে তাকিয়ে ইতস্ততঃ করে] আমার এই পাঁচটি টাকা [টাকা বের করে দিতে গেল] আপ্‌নাগো কাণ্ডে নিন।

প্রদীপ : পাঁচটাকা ! এই একটু আগে তোমাকে তোমার মা বাবা মারছিল না···কোথায় পেলে এ টাকা ?

বালিকা : এখন পাইনি, কাল রাত্রে পেয়েছি (আরক্ত হয়ে উঠলো)

প্রদীপ : কোথায় ? (থেমে) অঃ আমি কি নাটক দেখছি !

বালিকা : আপনারা যে দেশকে বাঁচাবেন—আমরাতো মরুমই আমাগো মতন আর জানি কেউ না মরে !

প্রদীপ : কে—কে বলে ? মিথ্যা কথা মিথ্যা কথা···তুমি জাননা কত দীনতা দলাদলি স্বার্থপরতা দিয়ে তৈরী আমাদের পার্টি। না বোন, তোমার এ রক্ত-তর্পণ নেবার মত যোগ্যতা আমাদের নেই, ফিরিয়ে নাও এ টাকা।

বালিকা : নেবেন না এ টাহা—আমি যে কত আশা কইরা (হঠাৎ কেঁদে ফেল) তাইলে আমার কি অইবো—কি অইবো আমার।

প্রদীপ : না না কেঁদো না কেঁদো না—একটা কিছু হবেই—হবেই—এ স্বার্থত্যাগ এ বলিদান···(থেমে) ভগবান···(থেমে) ভগবান হ্যাঁ, ভগবান আছেন বৈকি···হ্যাঁ, আমি কথা দিচ্ছি আমি আসবো শীগ্‌গিরই এসে তোমার সব সাহায্য নিয়ে যাব।

বালিকা : কখন ?

প্রদীপ : সময় হলে—নূতন দল নূতন মত নবজীবনের কথা নিয়ে আসবো আসবোই।

[একজন পুলিশ সাদিককে হাতকাপ লাগিয়ে এদিকে এলো] আরে একে যেন কোথায় দেখছি ও পুলিশভাই, দাঁড়াও তো একটু (ওরা দাঁড়ালো) আপনাকে—আচ্ছা আপনি নাড়িকেলডাঙ্গায় দিনুর দোকানে—মানে চম্পাদের চেনেন ?

সাদিক : ঠিক আন্দাজ করছেন—আমরা এক গ্রামের লোক ছিলাম। আপনি তো ইন্‌কিলাব বাবু আপনারে উহানে দেকচি—

প্রদীপ : তা আপনার এ হাল কেন ?

পুলিশ : বদমাইস···বিদেশী স্পাই···এদিকে থানার রিপোর্ট ঐ যে কি বল্লেন চম্পা নাকি ওকে নিয়ে ভিসা পাসপোর্ট ছাড়াই ওদেশে চম্পট দেবার তাল খুঁজছিল।

প্রদীপ : কিন্তু···কিন্তু···

পুলিশ : এতে আর কিন্তুর কি আছে মশাই—কাগজ পড়েন তো, প্রায় প্রতিদিনই মেয়ে চুরির ব্যাপার দেখবেন—আর তার বেশীর ভাগ এরাই করে —আশ্চর্য সাহস এদের···

সাদিক : তারা সেন, তারা সেন আমার নামে মিথ্যা রিপোর্ট করে ধরিয়ে দিয়েছে। পেটের জ্বালায় আসি এ দ্যাশে···কত মানুষই তো আসে ···খাইবো কি ওহানে। আব্বাজান মর-মর এত কইরাও ভিসা পাইলাম না, ই আল্লা···আখার যে কি অইবো! খোদার কসম, বিশ্বাস করেন বাবু ···এ সব আমি কিছু করি নাই···সব বানাইনা সব সাজাইনা।

প্রদীপ : তুমি করনি হয়তো ঠিক কিন্তু তোমার জাতভাইরা অনেকেই এমন সব অপকর্ম করে এ মিথ্যে নয়।

সাদিক : তার নিগা আমি জেলে যামু ?

প্রদীপ : হ্যাঁ তা কখনও কখনও যেতে হবে বৈকি। সারা দেশকে যারা এক সংসার না ভেবে কাজ করে মহাকাল তাদের দণ্ড দেবেন বৈকি! এই যে রিফিউজির দল ইষ্টিশনে পশুর মত ধুকছে কি তাদের পাপ ?

পুলিশ : বলি ও মিঞা চল এবার।

সাদিক : হ্যাঁ চলেন···একটু দাঁড়ান ভাই [একটি চাবি বের করে] ইন্‌কিলাব বাবু, আপনি তো ২৭ নম্বরের কারখানা চেনেন···জলিল মিঞার কারখানা, উহানে আমার এটা বাকস আছে···তার এই চাবিডা রাহেন··· কিছু টাহা আছে আপনি সে টাহা গুনা নিবেন।

প্রদীপ : হ্যাঁ ইউনিয়নের মিটিং-এ ওদিকে যেতে হয়···তা আমি টাকা নিতে যাব কেন ?

সাদিক : কবে ছাড়া পামু খোদা জানেন···আপনি আপ্‌নাগো পার্টির নিগা ও টাহা ডা নিবেন···আপনারাই তো আশা ভরসা।

প্রদীপ : বিদ্যুৎ ঠিকই বলেছিলেন, জনতা অন্ধ নয়, জনতা কবন্ধ নয়··· জনতা হচ্ছে নির্বান্ধব। শিক্ষিতের দল এদের পরিত্যাগ করেছে, ধনীরা করেছে শোষণ, আমরা করছি তোষণ আর নেতারা করছে প্রতারিত বন্ধুহীন···সত্যি তোমরা বন্ধুহীন। কিন্তু···(থেমে মেয়েটির দিকে চাইলো) দাও বোন তোমার টাকা·· (মেয়েটি টাকা দিল) দাও বন্ধু তোমার চাবি (চাবি নিয়ে) এ তোমার হৃদয়ের ঘরের চাবি···সেখানেই আমরা যাব এবার হ্যাঁ, প্রতিজ্ঞা করছি আমরা নূতন পথ নূতন জীবন গড়বো···ভগবান···হ্যাঁ,

ভগবানের নামে শপথ নিচ্ছি নবযুগের ভোরের দিকেই এগিয়ে যাব আমরা।

সাদিক : (পুলিশ টানতে লাগলো ওকে) খোদা আপনাকে ভাল করবো। চল্লাম বাবু···

প্রদীপ : বাবু নয়, বন্ধু বন্ধু···(জড়িয়ে ধরলো) এক দেশের মানুষ ভাই আমরা···অখণ্ড ভারত একটি সংসার বৃহৎ সংসার···(অস্ফুটস্বরে, সাদিককে ছেড়ে দিয়ে) অখণ্ড ভারত, অখণ্ড ভারত।

: দৃশ্যান্তর :

দ্বিতীয় অঙ্ক : তৃতীয় দৃশ্য

[কোলকাতার একটা ফ্লাট বাড়ীর একটা সাজান গোছানো ঘর। দেয়ালে কাঙলার রাষ্ট্রনেতাদের ছবি···ও রাজনৈতিক ভারতবর্ষের ছবি টাঙানো। ঘরের জানালার কাছে নেপথ্যে আত্রেয়ী দাঁড়িয়ে গুন্‌গুন্ করে গান গাইছে। ঘরে একটি চেয়ারে ৩৫।৪০ বয়স্ক উমাকান্ত বাবু বসে আছেন, তার বা হাতটা কাটা। গান শুনতে শুনতে তিনি অখণ্ড ভারতের মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন।]

॥ আত্রেয়ীর নেপথ্য সঙ্গীত ॥

জাগো·····জাগো·····জাগো
সিন্ধুর বন্দনা সিন্ধুর কথা
শুনেছ কি শুনেছ কি ভারত মাতা।
লীলায়িত ছন্দে নিশিদিন তোমারে বন্দে
কেঁদে বলে হেসে বলে···বলে জাগো জাগো···
তোমার আশীষে তোমার হাসিতে
জাগিবে নিখিল ধরা।
আকাশ বলে জাগো বাতাস বলে জাগো
আর কতকাল ঘুমের রেশে আর কতকাল তন্দ্রাবেবশে
রাখবে কোটি সন্তানেরে·····মাগো !···

উমাকান্ত : আত্রেয়ী···

আত্রেয়ী : [নেপথ্যে] বলুন—[প্রবেশ]

উমা : উমা গান গাইতে গাইতে ওধারে চলে গেল কেন ?

আত্রেয়ী : ওধারে যে আকাশ, আকাশে মন মেলে দেওয়া যায়···এদিক যে ঘর, মন গুটিয়ে যায় গুটি পোকার মত।

উমা : কিন্তু বাস্তবকে এড়িয়ে চলে লাভ কি বল ? রায়টের সময় বর্ডারে হাত হারিয়ে এসেছি···পরিজন আত্মীয় বিসর্জিত হয়েছে···তার চেয়েও বড় করে লেগেছে মনে, তাহল লক্ষ মানুষের মনুষ্যত্ব হীনতা, ক্লীব কাপুরুষতা !

আত্রেয়ী : কিন্তু তার জন্য রাজনৈতিক দাওয়াই ঠিক করা ঠিক নয় দাদা।

উমা : নান্য পথা...রাজনীতি বলে আঁতকে উঠলো তো চলবে না। "মহাভারত" পড়েছ তো, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের বাণী···

আত্রেয়ী : জানি। তা যদি বল ত ওরা কারখানা বলবে, মুশার বাণী, যীশুর বাণী নিয়ে উন্মত্ত হবে···দরকার হলে ভুল ব্যাখ্যা করবে···যা হয়েছে এতকাল। কি মনে হয় দাদা জানেন ? শুধু ভারত নয়, হিন্দু নয়···সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জন্য তিনি আসবেন, সেইরকম প্রস্তুতিই আমাদের দরকার। বিদ্যুৎদা বলেন—

উমা : শুনেছি ওর কথা কিন্তু ওভাই ঠিক বুঝে পারি না···আমি।

আত্রেয়ী : বুঝতে চান না যে···গোড়া থেকে গোঁড়া হয়ে আছেন নিজের মন-গড়া সিদ্ধান্তে। কিন্তু ভেবে দেখছেন না···বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক সাধনার ধারাটা ব্যর্থ হয়ে গেল কেন !

উমা : ব্যর্থ হয়েছে ঠিক বলি কি করে···মিথ্যে তো ভাবতে পারিই না। ১৯০২ থেকে ১৯১৫ বাংলার নেতৃত্বে অখণ্ড ভারতের যে রাষ্ট্র চেতনা তার নারায়ণ ছাড়া বোধ হয় জাত বাঁচতে পারে না।

আত্রেয়ী : কিন্তু চেষ্টার তো অন্ত নেই···তবু কি করে ব্যর্থতাই আসছে...

উমা : হ্যাঁ, দেশ ভাগ হয়ে আমরা একেবারে নির্বীর্য হয়ে পড়েছি। (প্রদীপের প্রবেশ) আর বিদেশ থেকে আমদানী করা কৃত্রিম মতবাদে আমরা কলের মানুষ হয়ে উঠলাম।

প্রদীপ : আমাকে দেখে মনে হল তো শেষের দুই ? তাহলে দেখছেন, আসলে ভারতের মাটিতে ওটা দাগ কাটতে পারে নি এখনও।

উমা : বসুন...বসুন।

প্রদীপ : (বসে) বসলাম কিন্তু এক গ্লাস খাঁটি ভারতীয় কুয়োর জল চাই আগে।

[স্মিত হেসে আত্রেয়ীর প্রস্থান] আপনাদের কাগজে সম্পাদকীয়টা পড়লাম এবার খুব মন দিয়ে।

উমা : হঠাৎ মনে লাগলো বুঝি।

প্রদীপ : তা হঠাতের দাম আছে বৈকি···অনন্তে হঠাতের সৃষ্টিই তো এই দুনিয়া। আপনাকে আমি একটা কথা স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করতে চাই··· (আত্রেয়ী জল আনলো, সেই জল খেয়ে) আপনি কি চান?

উমা : আমি নই আমরা। সারা ভারতের মানুষ চায় চাই—অখণ্ড ঐক্যবদ্ধ ভারত, চাই সাম্যবাদী সনাতন ভারত, চাই মহাভারত।

প্রদীপ : কি করে সম্ভব?

উমা : শুদ্ধাচারে। অতীতের ব্রহ্মচর্য্য, শুদ্ধজ্ঞান, পরাক্রম, আত্মসমর্পন ব্রত নিয়ে আবার কোটি কোটি সেচ্ছাসেবক ভারতমাতার মন্দিরে সমবেত হয়ে "বন্দেমাতরম্" বলে এসে দাঁড়াবে জেনে রাখুন সেদিন থেকে সত্যিকারের বিপ্লব শুরু হল।

প্রদীপ : কিন্তু এতে তো সাম্প্রদায়িকতা···

উমা : মিথ্যা কথা, সাম্প্রদায়িকতা নয়···এ হচ্ছে সারা দেশের জনগনের মুক্তির বারতা।

আত্রেয়ী : আপনাদের বুদ্ধির ফাঁদে পড়ে দেশের সরল সাধারণ মানুষ কবে যে নিজেরই গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়বে কে জানে। সত্যি আপনাদের বুদ্ধিবৃত্তির তারিফ করতে হয়।

প্রদীপ : (একটু স্বগত) একটী বাস্তুত্যাগী মেয়ে তার নারী জীবনের সব চেয়ে মূল্যবান জিনিস খুইয়ে যে অর্থ উপার্জ্জন করেছিল সেদিন তাই আমার হাতে তুলে দিলে, সে টাকা আমি কাকে দেবো উমাবাবু? পার্টির মিথ্যাচার ব্যাভিচারের সব খবরই তো আমি রাখি!

উমা : কি বলছেন আপনি?

প্রদীপ : একটি পূর্ববঙ্গের মুসলমান অসহায় তরুণ ছেলের ঘানি টানতে যেতে যেতে তার জমানো টাকা আমাকে দিয়ে গেছে···কিন্তু এত বিশ্বাসের ধারক তো আমি নই, মনে মনে তো সে খবর আমার জানা আছে উমাবাবু।

উমা : আত্রেয়ী, সিন্দুর বন্দনা বোধ হয় শুনেতে পেয়েছে ভারতমাতা। প্রদীপ বাবু, আপনি কি পার্টি ছেড়ে দেবেন ?

প্রদীপ : পার্টি আমি ছেড়ে দিয়েছি উমাবাবু···কিন্তু অসহায় মানুষের বিশ্বাসকে আমি অবমাননা করতে পারিবো না। সে সাধ্যও আমার নেই। ক্ষুদ্র দল গড়ে যুথাই আলোর সন্ধানে ঘুরে মরবো।

আত্রেয়ী : এ সবের উর্দ্ধে যে শক্তি তার আশ্রয় নিতে বাধা কোথায় আপনাদের !

প্রদীপ : এর উর্দ্ধে শক্তি !

আত্রেয়ী : হ্যাঁ, যা এতকাল কাব্যে শিল্প-সাহিত্যে শুধু তথ্য আর তত্ত্ব হয়ে আছে, সেই দিব্য শক্তিকে আশ্রয় করতে ইতস্তত: ভয় শঙ্কা কেন আপনাদের ?

প্রদীপ : আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

আত্রেয়ী : বুঝতে পারছেন না,···না বুঝতে চাইছেন না ?···উমাদাও রাষ্ট্রনীতির শিকলে বাঁধা পড়ে আছেন···তিনিও বুঝতে চান না। কিন্তু রাজনীতি আর অর্থনীতিতে পরিবর্তন আসবে সবার পরে। যখন অন্য সব দিকে প্রগতি ঘটবে, সামর্থ আসবে তখনই তা সম্ভব, পূর্বে নয়।

প্রদীপ : তাহলে···তাহলে বলতে চান···

আত্রেয়ী : বলতে চাই ভগবানই একমাত্র কারণ ও কারক তাঁর নির্দ্দেশ অবলম্বন করেন কায়মনবাক্যে তাঁরই পথ ধরে চলুন। অবশ্য নিষ্ক্রিয়ভাবে বা তামসিক ভাবে নয়, শক্রিয় শক্তিতে।

প্রদীপ : কি ভাবছেন উমাবাবু ?

উমা : ভাবছি ওদের কথাই ভাবছি···সত্যি ভাবছি···আচ্ছা প্রদীপ বাবু, আমাদের একটা মিটিং রয়েছে, চলুন না ভাবতে ভাবতে ঘুরে আসি।

প্রদীপ : চলুন, ঘুরতে ঘুরতে ভেবে দেখি।

(তিনজনে উঠে দাঁড়াল)

উমা : আর দেরী করা যাচ্ছে না। বিদ্যুৎ বোধ হয় আসবে না, আত্রেয়ী আমার ধারণাটা দেখছি ফলে যাচ্ছে।···

আত্রেয়ী : বিদ্রূপ···আমাদের পথ ছেড়ে দেবেন ?

উমা : হয়তো। দারুণ শক্ পেয়েছে। যাদেরও আধ্যাত্মিক মাধ্যম ভেবে প্রায় পূজা করতো তাদের ব্যাভিচার মিথ্যাচার জেনে সে আঁতকে উঠেছে···জীবনোত্তরণ পন্থা সম্পর্কে সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে···তাছাড়া ব্যক্তিগত জীবনের আন্তব আকর্ষণ তো আছেই। চল বলছি...

(তিনজনের প্রস্থান)

দৃশ্যান্তর

তৃতীয় অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য

[বালিগঞ্জে একটি সম্ভ্রান্ত ধনীগৃহে কর্তার কন্যার কুকুরের জন্মদিন উপলক্ষে ছোটখাটো উৎসবের আয়োজন হয়েছে। সন্ধ্যাবেলা,···বারান্দায় তরুণী বান্ধবী শর্ম্মিষ্ঠা দাঁড়িয়ে আছে...কঙ্কা এলো। বাইরে গাড়ীর হর্ণ।]

কঙ্কা : কে এলো বলতো শর্ম্মিষ্ঠা, বলতো কে!

শর্ম্মিষ্ঠা : কি করে কই ভাই, হয়তো মনের মানুষ যে! তুই কি আজকাল গাড়ীর ডাক শুনেই লোক চিনতে পারিস্ নাকিরে?

কঙ্কা : দেখ দেখ গাড়ীটা একেবারে ব্রাণ্ড নিউ—এ মডেলের গাড়ী হালে ফরেন থেকে আমদানী হয়েছে—কি নাম যেন—

শর্ম্মিষ্ঠা : সুগত সেনের রোজ গাড়ী না পাল্টালে কি মানায়—যে নাকি তোর...

কঙ্কা : যাঃ ও রকম গাড়ী অনেকেই পাল্টায়, এক গাড়ীতে রোজ রোজ কোন ভদ্রলোক আসে নাকি—দেখ ওটা শ্রীকান্ত শর্ম্মার গাড়ী...

শর্ম্মিষ্ঠা : মেয়োটাকে খুব গেঁথেছিস···

কঙ্কা : তুইতো অই জ্বালাতেই গেলি কিন্তু আমি তো পাত্তাবী ঝুলাইনি বলিহারি তোর টেষ্ট!

শর্ম্মিষ্ঠা : থাম ও আসছে—[শ্রীকান্ত শর্ম্মার প্রবেশ]

কঙ্ক : ধন্যবাদ মিঃ শর্ম্মা...এত কাজ ফেলে যে এসেছেন—

শ্রীশর্ম্মা : আরে ওকি কোতা আচে, আপ্নার কুকুরের Birth day আমি আসবে না—ক্লাবে ঠিক যেতে পারি না তাই বোলে কি বন্ধুত্ব ছাড়বো!

শর্ম্মিষ্ঠা : আলবৎ না—একটু সরবৎ খাবেন—চলুন ওঘরে সবাই রয়েছে।

শ্রীকান্ত : আপলোক কা বাত্, এ্যাসকিউস মি, এতো আচ্ছা সরবৎ আছে ...আচ্ছা হামি ও ঘরে যাই। (প্রস্থান)

শর্ম্মিষ্ঠা : একেবারে রসালু হয়ে উঠেছে! কিরে কি হলো—কি ভাবছিস্ (গাড়ীর হর্ণ) ঐতো বাঁশী...শ্যাম এলোরে ঘন শ্যাম—ঘন, একেবারে কাঠ হয়ে গেছে না-রে? আরে ঐতো হর্ণ (হর্ণ বাজালো) হর্ণ নয় যেন অর্গান!

কঙ্কা : নে থাম, ভাল লাগে না (নেপথ্যে কুকুরের ঘেউ ঘেউ)

শর্ম্মিষ্ঠা : তোর কুকুর লাইকা—তা তুইতো ওর সঙ্গে আমেরিকা যাবি তোর লাইকা থাকবে কার কাছে?

কঙ্কা : সেই কথাই তো ভাবছি—যদি যাওয়া হয়ে ওঠে—

শর্ম্মিলা : শেষে শ্যাম আর লাইকায় ডুয়েল ফাইট্ না হয়!

কঙ্কা : যাঃ কি সব আবোল তাবোল বক্‌ছিস!

শর্ম্মিষ্ঠা : আহা শ্যামের আর আসা হলো না—কাকাবাবু পাকড়াও করেছে। ভালকথা মনে পরেছে, গত হপ্তায় Tiger-এ বই দেখতে গিয়ে এক জনকে দেখে এলাম (গানের ভঙ্গীতে) সখী, দেখে এলাম তারে!

কঙ্কা : তোর আজ কি হয়েছে বলতো—পাঞ্জাবী নিয়ে তো এলি, বলি হোটেলে গিলে এসেছিস নাকি? তা কাকে দেখে এলি?

শর্ম্মিষ্ঠা : গোড়াতে দেখিনি অন্ধকারে ওরা এসেছিল, ইন্টারভ্যালে আলো জ্বালতেই দেখি পাশের সিটে বিদ্যুৎ রায় আর—

কঙ্কা : আর অমনি তোর বিদ্যুৎ খেলে গেল সারা অঙ্গে?

শর্ম্মিষ্ঠা : আহা বেচারা, এক বছরের সিনিয়র ছিল আমাদের, না? সেই কলেজ ইউনিয়ন সেই পিকনিক সেই মাঠ—সত্যি তোকে ভালবেসে ফেলেছিল ভালভাবে। তোর কাছ থেকে নিরাশ হয়ে কেমন খেপাটে হয়ে গেল তারপর ধরলো আধ্যাত্মিক পথ...ধোঁয়া ধোঁয়া জগৎ—স্থূল ছেড়ে একেবারে সূক্ষ্ম···· আহা!

কঙ্কা : তোরতো খুব সিম্‌প্যাথি দেখছি, তা বদলি গেলি না কেন!

শর্ম্মিষ্ঠা : দুধের স্বাদ কি আর ঘোলে মেটে বন্ধু? শ্যামের সঙ্গে যদি আমি ফরেনে যাই—থাক থাক আর বলবো না। থ্রিলিং খবর বলি; বিদ্যুৎ রায়ের সঙ্গে একজন সুশ্রী তন্বী বিধবা তরুণী দেখলাম—অবশ্য ও বল্ল তাই, নইলে চিনতে পারিনি বিধবা বলে। মেয়েটির সত্যি জৌলুস আছে—

এককালে দেবদাস-পার্ব্বতী নাকি ছিল দু'জনে। আবার টার্ণ নিচ্ছে বিদ্যুৎ রায়।

কঙ্কা : এর পরেই তোর দিকে!

শর্ম্মিষ্ঠা : না আর পড়বে না। কিরে মন খারাপ হচ্ছে? কাওকে জালিয়ে মারতে মেয়েদের বড় আত্মতৃপ্তি লাগে—থাক আর আমায় লুকোতে হবে না। ওকে তোর কুকুরের জন্মদিনের জন্য আসতে বললাম, উত্তরে কি বলে জানিস? বলে—'কুকুরের মত?'

কঙ্কা : বলে! সেই মেয়েটির সামনেই?

শর্ম্মিষ্ঠা : হ্যাঁ, মনে হলো সত্যি দুজনে ভালবাসে। যাক বেচারা তবু ঠাঁই পেয়েছে, যা হয়ে গেছিল! কিন্তু কথার ধার এখনও কমেনি এতটুকু। তোর কুকুরের জন্মদিনের খবর শুনে নাটকীয় ভঙ্গীতে নিঃশ্বাস ফেলে বলে—"সত্যি সেলুকাস, বিচিত্র এই স্থান!" সিংহীর সঙ্গে খুব লড়লে মানে, কথায়, তর্ক-বিতর্ক।

কঙ্কা : ও তোর সঙ্গে সিংহও ছিলেন—তাই বল!

শর্ম্মিষ্ঠা : বলবো কি বন্ধু, শেষে একবার বলে 'তোমারে বধিবে, যে গোকুলে বাড়িছে সে!' লোকটা দেখলাম রীতিমত ঘৃণা করতে আরম্ভ করছে আমাদের সোসাইটিকে। তোদের ফরেনে যাওয়ার কথায় একচোট খুব নিলে—সুগত সেনের মত ক্যাপিটালিষ্টরা জোচ্চুরি করে নাকি পাবলিক মানি নষ্ট করছে।

কঙ্কা : ইস্—মেরিট্ দেখতে হবে না—ওমন জুয়েল কটা আছে? শেষে প্রলেতেরিয়েত হোলো নাকি?

শর্ম্মিষ্ঠা : না তেমন তো মনে হলো না, তবে কেমন যেন সিনিক হয়ে উঠেছে। (অর্গানের শব্দ) ওরা সব এসে গেছে চল এবার—

কঙ্কা : যাচ্ছি তুই আগে চল তো (শর্ম্মিষ্ঠার প্রস্থান) অত মনযোগ দিয়ে কাগজে কি পড়ছো কাকাবাবু? (অধ্যাপক কামাখ্যা বাবুর প্রবেশ) করতো মাষ্টারী, তা ছাত্রের মত পড়াশুনা কেন!

কামাখ্যা : মাষ্টারদের পড়তে হয় ছাত্রদের চেয়ে বেশী, কিন্তু আমি পড়ছি আর এক ভিনিষ···উমাকান্তকে চেনো তো? আমার ক্লাসমেট্ ছিল। ও একটা নূতন দল খুলছে, দলভাঙা কিছু কর্মী তরুণকে পেয়েছে।···কিন্তু ওর উগ্র পলিটিক্যাল গ্র্যামারটা এখনও কাটলো না।

কঙ্কা : তাই নাকি? প্রদীপ মিত্র, বিদ্যুৎ রায় এরাও আছে নাকি

কামাখ্যা : প্রদীপ তো বড় পাণ্ডা...ঝাণ্ডা ছেড়ে ঠাণ্ডা হয়েছে এবার—তা শুনলাম তুমিও নাকি ফরেনে যাচ্ছ ?

কঙ্কা : একটা চান্স নিচ্ছি—বাবাকে দিল্লীতে লিখেছি যদি গভ্‌মেণ্ট ষ্টাইপেন জুটে যায় ভাল।

কামাখ্যা : এই জন্যেই দেশে কমিউনিষ্ট আইডিয়া গড়ে উঠেছে, এভাবে পাবলিক মানি নিয়ে তছনছ করা—যাবে তা যাও না বাবা, বাবার টাকার অভাব কিছু নেই।

কঙ্কা : ও সব তোমার দার্শনিক মাথায় ঢুকবে না, ওটা ইকোনোমিক্‌সের ব্যাপার।

কামাখ্যা : সে ঠিক···তা যাও তোমার অতিথিরা সব এসে গেছেন... কুকুরের জন্মদিন··· (প্রস্থান)

কঙ্কা : এ দেখছি দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ ! যতসব ছঃ (প্রস্থান)

(বাইরে লাইকার ঘেউ ঘেউ...আর আরও বাইরে শোভাযাত্রার চিৎকার "ইনক্লাব জিন্দাবাদ—আমাদের দাবী" ইত্যাদি)

: দৃশ্যান্তর :

তৃতীয় অঙ্ক : দ্বিতীয় দৃশ্য

[কোন কলেজের নিকটবর্তী একটি বাড়ীর বাইরের দিকে ঘর। কয়েকজন ছাত্র ও অধ্যাপক কামাখ্যাবাবু। নেপথ্যে ছাত্রদের হৈ-হল্লা চেঁচামেচি—"ইনক্লাব জিন্দাবাদ", "গভর্নিংবডির জুলুমবাজী"—"চলবে না চলবে না" ইত্যাদি ধ্বনি।]

কামাখ্যা : দু'দিন পরে যারা হবে দেশের নাগরিক—তাদের একি চেহারা, একি বক্তৃতা...পূর্ববঙ্গ থেকে দলে দলে এসে সব তচনচ করেছে সুপ্রভাত...এরজন্য আজ পশ্চিমবঙ্গবাসীদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে—নইলে আমরা যুদ্ধে শেষ হয়ে যাব।

জনৈক ছাত্র : এটাতো ঠিক কথা বল্লেন না সার, স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা রক্ত ঢাললো বেশী তাদের বাদ দিয়ে বাঁচার আয়োজন তো জীবনকে ব্যঙ্গ করা।

কামাখ্যা : ব্যাপারটা গভীরভাবে ভেবে দেখ—দেশভাগের আগে এত উশৃঙ্খলতা, করাপশন ব্যাভিচার কি ছিল? পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র আজ এই ব্যাধি...অস্থিরতা ..আমি বাঙাল খটি যুদ্ধের কথা বলছি না, বলছি দেশের নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গের সুস্থ জীবনের যারা অধিকারী তাদেরই হাতে দেওয়া দরকার। যারা নিজেরাই অসুস্থ ছন্নছাড়া তাদের হাতে নেতৃত্ব গেলে নেতৃত্বেও ওসব দোষ ঢুকে পড়া স্বাভাবিক। যা চলেছে গত আট-নয় বছর ধরে।

জনৈক ছাত্র : আপনি ওভাবে দেখছেন কেন স্যার,—এমনিই তো সাম্প্রদায়িকতা প্রাদেশিকতায় প্রাণ কণ্ঠাগত—তার উপর আবার খটি বাঙাল যদি জুড়তে যান—আর যারা উৎপীড়িত নিগৃহীত···নেতৃত্ব তো তাদের হাতেই যাওয়া দরকার। নইলে যে বিরাট ফাঁকি দেওয়া হবে—ফাঁক থেকে যাবে। আসলে সুবিধাবাদী স্বার্থান্বেষীদের হাতে নেতৃত্ব চলে যাওয়ায় এসব ঘটেছে।

[প্রৌঢ় হরিহর বাবুর প্রবেশ]

কামাখ্যা : আসুন, হরিহর বাবু আসুন। এই যে হরিহর ঘোষাল, আমার দেশের গ্রামের মানুষ—ছোটবেলা থেকে এঁকে চিনি·· সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের লোক, আজ তার কি দুরবস্থা। তিনটি ছেলে—একটি বেকার, একটির T. B. অন্যজন আধা-উপার্জনশীল···মেয়েরা বিবাহযোগ্যা, স্ত্রী বাতে পঙ্গু—উনি নিজেও সুস্থ নন। উনি খাটি পশ্চিমবঙ্গীয়। আর শুধু উনি কেন ওর মত কত শত শত লোক রয়েছে যাদের দেখবার জন্য কেউ নেই। কোন পরিকল্পনা নেই, কোন আয়োজন নেই···কিছু নেই। সমস্ত সাহায্য পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের জন্য!

হরিহর : একটা ভুল করছো কামাখ্যা ভাই! আমি স্বদেশী যুগ থেকে এ্যানার্কিষ্টদের সঙ্গে কাজ করেছি—তোমার সংকীর্ণ মতবাদ সমর্থন করতে পারছি না। পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববঙ্গ তো গৌণ, বিহার আসাম এসবও মানি না—আমাদের একমাত্র আরাধ্যা ভারতমাতা—অখণ্ড ভারত। যেমন করে হোক, যেভাবে হোক এ দ্বিধা বিভক্তি লোপ করতে পারলেই সব সমস্যার সুচারু সমাধান হবে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে পারলেই মুক্তি...নইলে সব হবে গোঁজামিল। ভেবে দেখ ভায়া, এই দশ বছরে কি হতে পারতো—দেশ ভাগ না হলে বাঙালী আজ দুনিয়ার সেরা জাতদের মধ্যে আসন করে নিতে পারতো।

[বাইরে কলেজের ছেলেদের হল্লা]

আর একটা ব্যাপার—কলকাতা শহরে সব কিছু কেন্দ্রীভূত করে রাখাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়—শুধু মুখের স্বাস্থ্যে—দেহ সুস্থ থাকে না—শুধু কলকাতা ফাঁপলে দেশ বাঁচবে না। বিকেন্দ্রীকরণ করা আজ একান্ত ভাবে দরকার।

কামাখ্যা : কথাগুলো মন্দ লাগে না শুনতে কিন্তু কাজ করতে হলে ভাব শুকিয়ে যায়…আর—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধই হয়তো প্রকৃতপক্ষে Corruption ব্যাভিচারের জননী—পূর্ববঙ্গবাসীরা উপলক্ষ মাত্র…সত্যি উত্তেজনায় আমি সত্য হারিয়ে ফেলেছিলাম।

জনৈক ছাত্র : স্যার, হরিহর বাবুর সাহায্যের জন্য যে টাকা তোলার কথা ছিল তা অনেকটা হয়েছে।

হরিহর : অশেষ ধন্যবাদ তোমাদের,কিন্তু ওটা আমাদের নূতন দলের ফাণ্ডে তুলে দাও।

জনৈক ছাত্র : সে কি করে হয়…তাছাড়া আপনার ছেলে আমাদেরই কলেজের ছাত্র ছিল…তার ওমন দুরারোগ্য ব্যাধিতে—

হরিহর : তার সব রোগ আরোগ্য হয়েছে…এই তো আমি দেশ থেকে আসছি…তার কোন রোগ নেই, কোন রোগ নেই তার [কাঁপছিলেন, কামাখ্যা বাবু ধরে বসালেন]

কামাখ্যা : আপনার ছেলে তাহলে—

হরিহর : নেই তাই পরশু রাত্রে—! (থেমে) গভ্‌মেণ্ট বেঁচেছে, তোমরা বেঁচেছো, আমিও বেঁচেছি—T. B. বেডের জন্য একবছর ধরে চেষ্টা, বেড্ আর পাওয়া গেল না…বৈশ্বানরের শয্যাতেই ভারতমাতার একটি অর্দ্ধ স্ফুটন্ত সন্তানকে তুলে দিতে হলো।…মা মহামায়া, জাগো আবার জাগো মা !

[দূরে নেপথ্যে চেচামেচি চীৎকার]

কামাখ্যা : কি হলো…এ তো কলেজ নয়…ইষ্টিশনের দিকে মনে হচ্ছে… রিফিউজী আস্তানার দিকে…অত আগুন…এই দেখতো দেখতো কি হলো কি হলো ! [কয়েকজনের প্রস্থান]

[প্রদীপের প্রবেশ]

এই যে প্রদীপ বাবু, কি ব্যাপার ?

[নেপথ্যে—"দাঙ্গা দাঙ্গা" "মার মার" "জল জল" "পুলিশ পুলিশ" "ডাক্তার এম্বুলেন্স" প্রভৃতি চীৎকার]

প্রদীপ : এই যে আপনারা তাসই হলো চলুন ··রিফিউজী আস্তানায় একটা পাগলা আগুন ধরিয়েছে···সুপ্রভাত, চেনতো···সেই গগন মণ্ডল Refugee !

কামাখ্যা : তাকে ধরুন না···ধরে ফেলুন ! (বাইরে চৈহল্লা)

প্রদীপ : ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে সে...আগুন লাগিয়েই ওদিকের চলন্ত ট্রেনের তলায়···

হরিহর : কি সর্বনাশ তাহলে তো পাগল নয়, অতিসুস্থ মনে হচ্ছে। আহা !

প্রদীপ : ঐ দেখুন কামাখ্যা বাবু···কলেজে যেসব ছেলে উৎশৃঙ্খলতা করে, নিয়ম ভাঙে...তারা কেমন সেবাপরায়ণ হয়ে উঠেছে···বাংলার তরুণের উপর ভরসা রাখুন···ক্ষুদিরামের উত্তর পুরুষ তারা···একই শক্তি দেখুন কত মহৎকার্যে ব্যাপৃত হতে পারে। যা ছিল অশুভ, তাই হয়ে উঠেছে শুভ··· আসলে নেতৃত্বের অভাবেই দেশটার এ হাল কামাখ্যা বাবু।

কামাখ্যা : হাঁা, আমার যেন ক্রমেই দৃষ্টি খুলে যাচ্ছে ভাই !

[পোড়া কাপড় পরে একটি রিফিউজী বালিকার প্রবেশ]

মেয়েটি : পাগল হাঃ হাঃ পাগল···ভাল অইচে ভাল অইচে পুইড়া মরচে, পুইড়া মরচে পাপ কলঙ্ক···

প্রদীপ : কে মাতি···সেই রিফিউজী মেয়েটি, তুমি আমাদের Fund-এ টাকা দিয়েছিলে।

মেয়েটি : ইনকিলাব বাবু, নমস্কার আপনি বড় পরিষ্কার···জানেন কি মজা, কি মজা ··আমি মরচি পুইড়া মরচি...আমার আর কোন পাপ নাই··· আর (হঠাৎ থেমে) যাও যাও ছুঁইও না আমারে ছুঁইও না মাইরাকালামু মাইরাকালামু থু থু (একটু থেমে) হাঃ হাঃ খুব অইচে···মইরা গেলা অত মদ খাইলা···ভাল অইচে···হাঃ হাঃ

কামাখ্যা : উঃ কি দৃশ্য হরিহর···আমারই ভুল হয়ে ছিল···এ আমি কি দেখছি...এই কি আমার দেশ !

প্রদীপ : মাতি, বোন শোন...আমি এসেছি...সেই বাণী নিয়ে এসেছি দল গড়েছি আমরা...মুক্তিকামী নবজীবনের জন...তোমার অর্থ বিত্ত সাহায্য নয় যে চাই কিন্তু···

মেয়েটি : কি ও ইনকিলাব বাবু, গোহাটি ঘিকা আমারেও নিয়া যাইবা —না না আমি যামুনা...যামুনা···থু থু···যাও যাও ইহান ঘিকা (হঠাৎ থেমে)

ছুঁইওনা আমায়, ছুঁইওনা মাইরাফালামু মাইরাফালামু। (থেমে) ও হো... মইরা গেলা মইরা গেলা। (কান্না)

প্রদীপ : কামাখ্যা বাবু, জানিনা ভারতমাতা আর কত রক্ত আর কত চোখের জল চান...এবার বোধ হয় আমাদের পালা (অস্ফুট স্বরে)'বন্দেমাতরম্'!

[দৃশ্যান্তর]

তৃতীয় অঙ্ক : তৃতীয় দৃশ্য

[পশ্চিমবঙ্গের সেই গ্রাম যেখানে প্রদীপ পূর্বে পার্টি organise করতে এসেছিল। ওদের পূর্ব-পার্টির অফিস। লোহিত ও মুক্তিপদ।]

মুক্তি : পার্টির ভিতরে এমন জট আগে কখনো পাকায় নি সত্যি এত মিথ্যাচার আর সহ্য করতে ইচ্ছে হয় না...প্রগতির পথ কি মিথ্যাচার দিয়ে তৈরী!

লোহিত : রিএ্যাকসনারি নাড়ীভুঁড়ি পাল্টাতে হবে কম্‌রেড্। যে সমাজে হালে রয়েছে, যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রতিদিন গ্রাসাচ্ছাদন করছো তার তো আগাগোড়া চুরি জোচ্চুরি, বাটপারীতে ভর্তি...সমস্তটাই যে ঘুণ ধরা তার কথা আগে ভাব তো!

মুক্তি : ভেবেছি, ভেবেই বলছি...আর প্রদীপদা টার্ণ নিয়েছে এখবর পেয়েও তুমি এখনও মত আঁকড়ে রয়েছো কেন?

লোহিত : বিশ্বাস করিনা—আর যদি টার্ণ নিয়েও থাকে—তবে তাকে সরে দাঁড়াতে হবে জনতার পথ থেকে। cult of personality এখানে চলবে না...সর্বহারাদের পথে কোন রকম রিএ্যাকসনারী আদপ চলবে না কম্‌রেড। [বাইরে বহু কণ্ঠে "ইন্‌ক্লাব" ধ্বনি] কাণ পেতে শোন বন্ধু, নূতন যুগের আজান—এক কথা এক পথ এক গতি!

[সত্যজিতের প্রবেশ]

সত্যজিৎ : প্রদীপবাবু দলবল নিয়ে এসে ওপাশের মাঠে পাল্টা মিটিং শুরু করে দিয়েছে—সত্যি তার মত পালটে গেছে...পার্টি ছেড়ে দিয়েছে। হেড অফিস থেকে কড়া নোট এসেছে, প্রদীপ মিত্র সম্পর্কে কঠোর হতে...প্রদীপ সম্পর্কে এখানকার কেন্দ্রে কর্মীদের কমবেশী প্রায় সবারই

weakness রয়েছে তা কাটিয়ে উঠতে হবে। কিন্তু মুসকিল হয়েছে এখানকার কমিউনাল রমতাজ খাঁ পর্যন্ত মত পাল্টিয়ে ওর দলে ঢুকে পড়েছে—

মুক্তি : দাঙ্গায় যেচারা মরতে মরতে বেঁচে গেছে, বলতে গেলে প্রদীপদাই বাঁচিয়ে ছিলেন...কৃতজ্ঞতা আছে বলতে হবে।

সত্য : কিন্তু শেষ পর্যন্ত এখানকার ফ্রন্টটা কি রিএ্যাকসনারিদের হাতে চলে যাবে?—এতদিনের পরিশ্রম পণ্ডশ্রমে পরিণত হবে?

লোহিত : না না কিছুতেই না, দরকার হলে দু'চার জনকে ধরাধাম থেকে বিদায় নিতে হবে—আমরা এগিয়ে যাবই আজ জাগ্রত জনতা—গণদেবতা—ঐ তো তাদের ধ্বনি!

[নেপথ্যে সমবেত কণ্ঠ—"বন্দে মাতরম্"—"বন্দে মাতরম্""অখণ্ড ভারত"—"জয় হোক জয় হোক"]

মুক্তি : কি ব্যাপার, এ দেখি উল্টো বকতে আরম্ভ করলো—অন্ধজনতার অন্ধত্ব কবন্ধত্ব ঘুচলো তাহলে। [প্রস্থান]

লোহিত : তাই তো—তলে তলে প্রদীপ তো বেশ গুছিয়ে নিয়েছে—বেশ বশ করে ফেলেছে—

(রমতাজের প্রবেশ)

রমতাজ : ই আল্লা আপনারা এখানে, চলুন চলুন সভায় যাই।

লোহিত : আমাদের সঙ্গে কি রসিকতা করতে এসেছেন?

রমতাজ : এ কথা বলছেন কেন! এতকাল বরং আপনারাই আমাদের সঙ্গে রসিকতা করে এসেছেন। একটা দেশ এক আকাশ এক বাতাস নদী জল ফুলফল ভোগ করে আধ্যাত্মিক আত্মিক পরিমণ্ডলে যে অখণ্ডতা গড়ে উঠেছে যুগ যুগ ধরে তিল তিল করে—দু'দিনের কৃত্রিম মতবাদ তা কি ধ্বংস করতে পারবে বলুন।

সত্যজিৎ : কিন্তু আজ আপনি যে 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ করছেন এক কালে আপনাদের শ্রেষ্ঠ নেতারা তা সাম্প্রদায়িক বিশেষের বলে বর্জন করেছিলেন—

রমতাজ : তারা অনেক কিছুই বর্জন করেছিলেন এবং বৃথাই গর্জন করে সর্বনাশা পথে দশ কোটি মানুষকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে গেছিল। বলতে ইচ্ছা হয় কবির ভাষা একটু পালটে,—

দশ কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননী
রেখেছিলে অন্ধকারে মানুষ করনি।

সত্যজিৎ : তাই বলে বন্দেমাতরম্—!

রমজান : ওসব সেন্টিমেন্টে যা দিয়ে আর কোন লাভ হবে না সত্যজিৎ বাবু—সত্যকে জয় করার সাধনা করুন। অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে যে সত্য আজ পেয়েছি—আর তা হারাব না। গত সাত আটশ' বছর ধরে হিন্দু ভারতেই তো মুসলমান সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে··· হিন্দু ভারত বন্ধুর মত ভাইয়ের মত ইসলামকেও বরণ করে নিয়েছে। 'কোরবাণী'কে সনাতন ভারত বুক পেতে নিয়েছে বন্ধু। সনাতন ভারতের মত মহান আর কি আছে! এই যে আপনি এখানেও এসেছেন ভালই হলো। লোহিত, উনি লতিকা রায়।

লোহিত : অঃ মানে মানে—বিদ্যুৎ বাবু—নমস্কার—

লতিকা : নমস্কার, অত শঙ্কা কিসের—বিদ্যুতের আর সে ঝলক নেই—তা বিদ্যুৎ রায়ের কোন সন্ধান আপনাদের কাছ থেকে কি পাওয়া যেতে পারে? ওকে আমার বিশেষ দরকার—শুনলাম প্রদীপবাবুদের সঙ্গে এখানে এসেছে সম্প্রতি! বিশেষ কারণে তাকে [বিদ্যুতের প্রবেশ] দরকার—

বিদ্যুৎ : ক' কারণ?

লতিকা : এই যে চাতক-দল এসেছ—তা পালিয়ে ফিরছ মনে হয়।

বিদ্যুৎ : মনে হয় তোমার মনগড়া কল্পনা-কথা ওটা—তাই কি তুমি শোধ নিতে শেষ পর্যন্ত এদের দলে যোগদান করলে?

লতিকা : যোগ মনে মনে বহুদিন থেকেই করছিলাম 'দান'টা ঘটেছে হালে—হালে যখন পানি পাচ্ছিলাম না, পুতুল খেলায় অস্থির হয়ে—শর্মিষ্ঠাদেবীকে চেনো তো? সেই যে টাইগারে দেখা হলো, সত্যি বাঘিনী মেয়েটা—ওতো আমাদেরই দলের একজন!

বিদ্যুৎ : শুধু বুদ্ধি আর জৈবিকতার ঘানি ঘোরা টানে তারা তোমার দল ছাড়া যাবে কোথায় বল—

লতিকা : বললো ও অনেক কথা...শুনে মন প্রাণ দেহ আত্মা জুড়িয়ে গেল!

বিদ্যুৎ : আমারও কম জুড়োচ্ছে না—রায় বাড়ীর সেই মিষ্টি বৌটি আজ এমন তিক্ত হয়ে উঠেছে যে—

লতিকা : ঐ সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়েই তো এতকাল প্রভুত্ব করে এসেছ এখন তিতে লাগবে বৈকি...

বিদ্যুৎ : লতিকা, এসব কথা থাক—আমায় মুক্তি দাও—

লতিকা : বাঃ খাসা বীরপুরুষ! মুক্তিপদবাবু, দিন মুক্তি দিন একে! উঃ প্রবচনটা আজ উল্টে বলতে ইচ্ছে করছে "দেবা ন জানন্তী কুতঃ নারী।

বিদ্যুৎ : লোহিত, তুমি নিশ্চয়ই সব্যসাচী মিত্রের নাম শুনেছ?

মুক্তি : হাঁা উনি তো পুরোনো বিপ্লবী দলের লোক ছিলেন!

বিদ্যুৎ : লোক নয় দেবতা...আহা মানুষটা মেঝেতে মাথা খুঁড়ে সুই-সাইড্ করলে আর আমারই দুই চোখের সামনে—উঃ কি নিদারুণ শাস্তি! নিরুপায় দর্শকের মত আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিংহ শাবকের মৃত্যু যন্ত্রণা, ব্যর্থতার যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করলাম। উঃ ভগবান!

লোহিত : রিএ্যাকসনারি। শুনেছিলাম, তার একটা মস্ত সেচ্ছাসেবক বাহিনী ছিল, তারা নাকি তৈরী হচ্ছিল জোর করে বর্ডার ডিঙাবে বলে, বিভক্তি লোপ করার এমন হাস্যকর প্রচেষ্টা—

বিদ্যুৎ : হাস্যকর হাস্যকর, হাসো হাসো প্রাণভরে হাসো...হাসিতো কান্নারই অনুরূপ ওপিঠ, না হেসে কি আর করবে বল! আমি কাঁদি উঃ ভগবান (চোখ ছল্ ছল্ করে উঠলো) "হাজার হাজার সৈন্য পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলো আর পরাজয় পেছন থেকে এসে তাদের কালিমা মাখিয়ে দিয়ে গেল"—কে কৈফিয়ৎ দেবে? একা সব্যসাচী মিত্র না আমি, লোহিত, মুক্তিপদ, লতিকা রায়? (থেমে) সমস্ত দলটা বিট্রে করেছে। অর্থে কর্মে সততায় প্রতিশ্রুতিতে সর্ব্বত্র প্রতারণা···পরশু রাত বারটায় ওরা বিশহাজার স্বেচ্ছাসৈন্য সীমারেখা ডিঙাবে বলে সব ঠিক—আট নবছরের সাধনা দিয়ে সব্যসাচী মিত্র যে দিনটির জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল—কিন্তু কার্যকালে কেউ এলো না। না টোটা না বন্দুক না লোক—শুধু শ'দুয়েক কিশোর নকল গড়ে গিয়ে হতাহত হলো! সব্যসাচী মিত্রের দুটি দুধের ছেলে গুলি খেয়ে মরলো। আর বুড়িবালামের তীরে বাঘাযতীনের মত অসহায় ভাবে ছুটোছুটি করে শেষে অসহায় ভাবে মাথা খুঁড়ে আত্মহত্যা করলো সব্যসাচী মিত্র। আর আমরা হাসছি হো হো করে হাসছি! দেশকে যিনি মা ভেবেছেন, সারা ভারতকে যিনি জীবন্ত সত্তা বলে অনুভব করে অস্থির হয়ে উঠেছেন—অখণ্ডত্বের

অন্ত—মায়ের ব্যথা বুঝে মৃত্যুপণ করে কর্ম্মে ব্রতী হয়েছেন, তাঁকে আমরা নির্ব্বুদ্ধিতার প্রতীভূ জ্ঞানে ত্যাগ করে আত্মপ্রসাদে হাসছি। হায়, ভগবান !

লতিকা : আমায় ভুল স্বীকার করতে, ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ দেবে ?

বিদ্যুত : মানুষ অনেক ভুল করে কিন্তু তাই বলে সত্য মিথ্যা হয়ে যায় না ; আমি ভুল করে পথ থেকে সরে গেছিলাম কিন্তু পথ আমার জন্ত অন্ত দিকে সরে যায় নি...আমাকেই আবার গিয়ে পথে উঠতে হবে। ঘর ছেড়ে এসে যদি পথ খুঁজে থাক তবে এসো অন্তভাবে সে পথে উঠি, ক্ষমা প্রার্থনা অর্থহীন, যদিনা সত্যিকারের নিষ্ঠা নিয়ে ভুল সংশোধন করি। [বাইরে সমবেত কণ্ঠে "বন্দে মাতরম্"] জাতির জীবনে আজ যে প্রশ্ন, যে সমস্যা তার জন্ত সহজ সরল পাশব বৃত্তিরও একযুগ স্থগিত রাখা অন্যায় নয়, আর বৃহত্তর প্রয়োজনে জীবনোত্তরণের প্রশ্নে এসব তো সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। লতিকা, ভুল আমরা সবাই-ই করছি। কাম আর মৃত্যুর কাছে মানুষের মত অসহায় আর কে আছে—তবু যদি কোন গতিকে দিব্যজীবনের সুর উঠেছে জীবনে তাকে বরণ করে ধারণ করার শক্তি সঞ্চয় করাই ঠিক।

লোহিত : জীবন কবিতা নয় বিদ্যুৎ।

বিদ্যুৎ : ভুল করলে বন্ধু, মস্ত ভুল করলে—জীবন কবিতার চেয়ে বড় জীবন কাব্য, জীবন গান। বাইরে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি)

[দৃশ্যান্তর]

চতুর্থ অঙ্ক : ১ম দৃশ্য

[বালিগঞ্জে কঙ্কাদের বাড়ী। বাইরের বসবার ঘরে বসে কঙ্কার বাবা প্রতীক্ষা চ্যাটার্জী পাইপ টানছেন। অধ্যাপক কামাখ্যাবাবু খবরের কাগজে চোখ বুলাতে বুলাতে ঘরে ঢুকলেন।]

প্রতী : কি খবর, রোব্‌বারটা কি খবরের কাগজেই কাটাবে নাকি হে ?

কামাখ্যা : কি আর করি। তোমাদের ইল্লী দিল্লী ভল্গা টেনিসের খোয়াব দেখে লাভ কি ? তার চেয়ে মজা অজয় রূপনারায়ণ আর বিদেশী মেঘনা যমুনা।

প্রতী : ওসব কি আর তোমার দার্শনিক মস্তকে ঢুকবে ব্রাদার, তা যদি হতো এতকাল এখানে বেসরকারী কলেজে পড়ে থাকতে না, থাকতে—

কামাখ্যা : দিল্লী মসনদের কাছাকাছি ! হায়, সরকার তোমার বেসরকারীদের কি suffering দেখ। সত্যি Democratic secular country India আর তার genuine নাগরিক হচ্ছো তোমরা। তুমি, মিত্রসাহেব, শ্রীকান্ত শর্ম্মা, বি, লতিফ, ডি, পাণ্ডা। কিন্তু দেখেছো imperelist কাগজের কাণ্ড ; নূতন Nationalist প্রদীপ উমাকান্ত-দের খবর কত flash দিয়েছে ?

প্রতী : What ? oh সেদিন বলছিলে বটে, কি যেন একটা নতুন দল হয়েছে, তা দেখ হাতে পাওয়ার জন্ত নতুন নতুন flash দেবে বৈকি ! আর যাবেই বা কোথায়, দল কর যাই কর ; Commonwealth, নয় আমেরিকা নয় Red country, এ ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব অবাস্তব।

কামাখ্যা : ওরা কিন্তু অবাস্তব কাণ্ডই করতে যাচ্ছে। Settled fact কে unsettle করতে চায়। ওরা বলে India is a living soul.

প্রতী : পাগলে কি না বলে—থাক, ওসব থাক। কল্কার কথা ভাবছি।

কামা : ওরতো কোনই ব্যবস্থা করতে পারলে না। Foreign যাবে, যাক না। গভ্‌মেণ্ট থেকে টাকা কিসের দরকার ? নিজের থেকেই দিয়ে দাও না। সুগত সেখানে গিয়ে পুরনো হয়ে গেল আর ও কি না প্লেনের টিকিটই কিনলো না। এ অন্যায়।

প্রতী : কিন্তু ওরা যে বলছে Just after a month একটা stipend এর ব্যবস্থা হবেই, তা' যদি হয় তা'হলে এতগুলি টাকা বেঁচে যায়। আমি যদি খরচ করে পাঠাই Income Tax থেকে আটকে ধরবে, এমনিতেই Case ঝুলছে। ওসব economical ব্যাপার তুমি বুঝবে না, sentimental কল্কাও এখন বুঝতে চাইছে না।

কামাখ্যা : Then what can I do—nothing...can only join Pradip & Co.

প্রতী : শেষকালে তুমিও ঐ উন্মাদদের দলে যাবে নাকি ?

কামাখ্যা : তাই ভাবছি।

প্রতী : হ্যাঁ বুদ্ধিমানের কাজ ভেবে যাওয়া, কিন্তু কোন ক্রমেও কোন দলে যোগ না দেওয়া।

কামাখ্যা : বাঃ খাসা থিওরি তো...নিষ্কর্ম্মবাদ প্রচার কর না কেন। O. P. I-এর এই তো আদর্শ !

প্রতী : ওসব তোমাদের কর্ম্ম...আমার বস্তুতে প্রতীক্ষা চ্যাটার্জি নেই, সে প্রতীক্ষায় আছে দিশী-বিদেশী সোনার তালের জন্য...আরে এসো এসো শ্রীকান্ত যে ! (শ্রীকান্ত শর্ম্মার প্রবেশ) তোমাকেই তো খুঁজছিলাম বস [কামাখ্যাবাবুর প্রস্থান। শর্ম্মা বসলো] তারপর খবর বল—জাহাজ এ সপ্তাহে আসছে তো ?

শ্রীকান্ত : জাহাজ তো আসছে কিন্তু রেমণ্ড সাহেব বড় বেশী হাঁকছে ওর সঙ্গে দেখছি আর good terms থাকবে না !

প্রতী : না না Don't do that ! ওদের সঙ্গে লড়ে ক্ষতি ছাড়া কিছু হবে না। আসলে ওরাইতো সব। স্বাধীনতা বল, ফিনান্স কমিশন বল, সব তো ওদের বলে বলী—কে না জানে economically we are nothing...স্বরাজ হাঃ হাঃ Really it makes me laughing. By the By ওসব থাক Hear me young chap...রাশিয়ার সঙ্গে Recently India এর যে Trade হচ্ছে ওতে আমি জাল পাত্‌ছি... ওকে কোন রকমে ধরে ভাল steel আমদানী করতে পারলে—সত্যিকারের একটা capital হাতে আসবে।

শ্রীকান্ত : কিন্তু সাহেব যদি টের পায়।

প্রতী : You make me laugh ; টের পাবে কি করে তোমার নামে ওটা না করে আমার নাম কর...বা আমার ছেলের নামে। আর একটা খবর শোন, নেহেরুর কিছুটা বিড়লা ভীতি এসেছে...এই সুযোগে আমাদের কিছু কাজ বাগাতে হবে। ব্যাপারটা কি জান...He thinks himself helpless in the hands of Birla—but it is fact, but he can't do anything...আসলে তো বিরলা গভর্ণমেণ্টই হয়েছে ভারতে। ওদিকে টাটা টা-টা করে চলেছে। It it our chance.

শ্রীকান্ত : কিন্তু শাহজী বিড়লা অন্তপ্রাণ।

প্রতী : আমরাও···তুমি দেখছি এখনও ছেলেমানুষ। কাল দিল্লী যাচ্ছি, আশাকরি তুমিও আমার সঙ্গে চলবে···অনেক কাজ আছে তাছাড়া

তোমার Backing-এ তো কঙ্কার সেই Govt. Aid-টার ব্যবস্থা করতে হবে। ওর foreign-এ যাওয়া তোমার উপর নির্ভর করছে।

শ্রীকান্ত : I w'll do my best—তা ও বাড়ী আছে নাকি ?

প্রতী : দেখছি (Calling Bell টিপলেন, চাকর এলো) আচ্ছা তুই যা আমিই দেখছি (চাকরের প্রস্থান) just a minute (প্রস্থান)

শ্রীকান্ত : Cleaver tricks...She will meet her chosen fellow and I only ferry her...Oh, what a cleaver plan. But that must not be...Mr. Chatterjee you think to-much of you. I can't leave Kanka...She can not sail...never...never (শর্ম্মিষ্ঠার প্রবেশ) And আরে—

শর্ম্মিষ্ঠা : আরে আপনি যে, তা কি soliloquy চালাচ্ছেন !

শ্রীকান্ত : Rapture & Foil make soliloquy. তারপর শুনলাম আপনিও নাকি High society-র মুখে কালি মাখছেন...মানে প্রদীপদের দলে যোগদান করছেন !

শর্ম্মিষ্ঠা : কি আর করি বলুন···আপনারা দলবেধে দেশটাকে তো লুটের মাল করে তুলেছেন—But our Forefather sed blood not for this cause.

শ্রীকান্ত : I see ! তারপর সম্বল সিংএর পবর কি ?

শর্ম্মিষ্ঠা : সিংহ ব্যাঘ্র কি আর মনুষ্য সমাজে থাকতে পারে ? তারা সিংহ ব্যাঘ্র সিংহী ব্যাঘ্রী নিয়েই থাকে—High societyএর ব্যাপারই High !

শ্রীকান্ত : তাই বলুন !

শর্ম্মিষ্ঠা : কি আর বললো ! বলবো যখন Mystry of Birla Houseএর মত আমিও লিখবো Mystry of Sharma & Sighji's House সেই দিন, তখন শুনবেন !

শ্রীকান্ত : Noble work I think...হাততালি পাবেন, চেষ্টা করলে এ্যাসেম্ব্লিতে একটা চেয়ারও পেয়ে যেতে পারেন। কিন্তু You will remain ever mysterious & dangerous ! সত্যি আপনাকে দেখতে ফুলের মত কিন্তু আসলে—(প্রতীক্ষবাবুর প্রবেশ) wish your good luck !

প্রতী : (বসে) না কল্কা কোথায় বেরিয়েছে—

শর্ম্মিষ্ঠা : আমাকে যে Phone করলো—এক সঙ্গে আমরা বিদ্যুৎবাবুর ওখানে যাব যে—

প্রতী : আঃ বিশেষ কাজে বেড়িয়েছে—ঠিক আছে শ্রীকান্ত—কাল তো প্লেনে দেখা হবে—আরে আজ বিকেলেই তো কিসের function হবে...তুমিই তো সভাপতি আচ্ছা কল্কাকে নিয়ে যাব...তখন সব কথা হবে—

শ্রীকান্ত : আচ্ছা আমি তবে আসছি (প্রস্থান)

শর্ম্মিষ্ঠা : আমিও তবে চলি—

প্রতী : শোন—

শর্ম্মিষ্ঠা : বলুন—

প্রতী : দয়া করে তুমি আর এ বাড়ীতে এসোনা...ভাগ্যবন্তদের দল বাড়াবার জন্য কল্কাকে পাবে না। আসতে পার।

শর্ম্মিষ্ঠা : অশেষ ধন্যবাদ...Thank you ! (প্রস্থান)

বাইরে "ইনক্লাব..." ধ্বনি।

: দৃশ্যান্তর :

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথের ফুটপাথ। অদূরে গাড়ীর পার্কিংয়ের শব্দ। একটু দূরে ডাষ্টবিন। অদূরে বিরাট প্রাসাদোপম গৃহে বিবাহ উৎসবের সুর শোনা যাচ্ছে। সকাল বেলা। যবনিকা উঠতে দেখা গেল তরুণ কবি শশাঙ্ক দুহাতে মুখ ঢেকে ঢুকলো।

শশাঙ্ক : উঃ ওঃ ছোয়াট এ হেল ইট ইজ! কবিতা? নো নো—অসম্ভব—(প্রদীপের প্রবেশ)

প্রদীপ : কি কবি, ভাঁতকে উঠলে কেন...ও কুকুর বেড়ালের সঙ্গে বড়লোকের ভুক্তাবশিষ্ট নিয়ে মানুষ হানাহানি করছে, তাই দেখে?

শশাঙ্ক : হ্যাঁ না না...ঐ দেখ ক'টি মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে মেয়ে আমাদের দেখে ছুটে পালাল...এতক্ষণে এখানে দাঁড়িয়ে কি লোভাতুর দৃষ্টিতে নোংড়া ডাষ্টবিনের উচ্ছিষ্ট খাবারের দিকে তাকিয়ে ছিল। ওরা হাত পাততে পারে না...হাত তুলে মারতেও ভুলে গেছে—ওরা শিখেছে অসহায়

ভাবে মরতে। ওরা কারা জান? আমরা, বাংলার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়... বঙ্গের মধ্যমণি কিন্তু এমন অসহায় বুভুক্ষু রূপ—এমন জৈবিক জীবন... না না প্রদীপ আর কাব্য নয়—প্রদীপ আমায় তোমরা মুক্তি দাও!

প্রদীপ: কে তোমায় ধরে রেখেছে বন্ধু? বন্ধন আর মুক্তি সবই যার যার মনের মনগড়া দৌলত। ওরা কারা ছবি তুলছে না?

শশাঙ্ক: হ্যাঁ এই বুভুক্ষু জীবনযাত্রা ক্যামেরায় ধরে দেশান্তরে বাহবা কুড়াবে অথবা আর্ট করবে অথবা করবে পলিটিক্স্ নয় তো শিল্প···উঃ এই নারকীয় জীবন এ যদি শিল্প···লেট্ মি সুইসাইড ব্রাদার সুইসাইড!

প্রদীপ: (হাস্য) হুঃ কবি এতেই চম্‌কে উঠছ! কবি, নূতন যুগের ভোর হবার আগের রাত এখন। প্রভাত হবার আগে রাত্রির গভীরতা জানতো···পড়েছ তো শেলীর কবিতা?

শশাঙ্ক: হ্যাং ইওর কবিতা। কবিতা মুর্দ্দাবাদ—রুটি চাই রুটি—টুটি চেপে ধরতে পারবে? চাই বিদ্রোহ, চাই বিপ্লব—চরম আঘাত। মানুষকে আগে বাঁচতে দাও, কবিতা কাব্য হবে পরে—

প্রদীপ: ভুল বলো ভাই, একটু ভুল বলো। তোমার ইপ্সিত সত্য সাহিত্য-শিল্পই রূপ দিতে পারবে। ভবিষ্যতকে গড়তে শিল্পী-কবিরা তো ভগবান বিশেষ। বিশ্বের দেশে দেশে বিপ্লব চক্রের ইতিহাস জান তো? কোন দেশ মহৎ সাহিত্য ছাড়া বল পেয়েছে ভাই?

শশাঙ্ক: আর সবচেয়ে সমৃদ্ধ সাহিত্য থাকতে ভারতের মত অধোগতি কোন দেশের হয়েছে বল?

প্রদীপ: ঠিক তা নয়। যেদিন থেকে সাহিত্য-শিল্প ভারতের ঐতিহ্য ছেড়ে বিপথে গেছে, আমরা সনাতন ধর্ম্মকে অস্বীকার করতে শুরু করেছি সেদিন থেকেই তোমার কল্পিত অধোগতি ঘটেছে।

শশাঙ্ক: (হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে) না না আমি ওসব মানিনা, কারো ধার করা মতবাদে আমি বিশ্বাসী নই···আমি—আমিই—

প্রদীপ: ওই তো মুস্কিল—তুমি—তুমি, তুমি আছ আর সারা দুনিয়া যেন তোমাকেই কেন্দ্র করে ঘুরছে...

শশাঙ্ক: তুমি কি বলতে চাও?

প্রদীপ: আমরা প্রত্যেকে যার যার ছন্দে চলবো বৈকি কিন্তু সব ছন্দের একটা উৎস তো আছে ভাই, তাকে অস্বীকার করে মিথ্যা

দার্ঢ়িকতা প্রকাশে কি ফল বল ? মনে মনে যারা ভিক্ষুক মাত্র···জন্ত মাত্র কি তারা দেবে সাহিত্যে ? মনে মননে তুমি রাজা হও, সম্রাট হও দুঃখ মিথ্যা বিভীষিকার স্বপ্ন না দেখে রূপান্তরিত কল্যাণ মঙ্গল শ্রীর স্বপ্ন দেখ...মানসিকতায় আন সুস্থতা আন অভীপ্সা—তবেই আমরা বাঁচবো, দেশ বাঁচবে, সত্য শিব সুন্দর যদি না হয় তবে কিসের শিল্প—ধিক্ কবি তোমায়—[বিদ্যুতের প্রবেশ]

[ওদিকে গাড়ীর পাকিংয়ের শব্দ। দারোয়ান ডাষ্টবিনের ধার থেকে ভিখারীদের তাড়ালো—"এই হট হট..ভাগ ভাগ...সুয়ার কা বাচ্চা"]

শশাঙ্ক : উঃ কুকুর বেড়ালকেও বোধ হয় এমন করে তাড়ায় না !

বিদ্যুৎ : এমন জীবন্ত নাটক থাকতে আমরা পয়সা দিয়ে stageএ যাই কাঁদতে। কান্নাকে, ক্ষুধাকে, মিথ্যাচারকে সেখানে Art করে দেখানো হয় ! সত্যি দুনিয়াটা নাটমঞ্চ বটে। মাঝে মাঝে মনে হয়, সত্যিকারের একটা নাটক লিখি।

শশাঙ্ক : আপনি নাটক লিখবেন !

বিদ্যুৎ : অবিশ্বাসের কি আছে...বলুনতো মানুষকে বুঝিয়ে দেব সত্যি সত্যি জীবনটা নাটক নয়—জীবন অমৃত !

শশাঙ্ক : কিন্তু তারা কি বুঝতে চাইবে ওসব কথা—তারা তো মন-গড়া ভাবেই সব কিছুর বিচার করে ফিরে যাবে...

প্রদীপ : কথাটা ঠিক...নইলে যুগে যুগে অবতার এসেও আমাদের কিছু করতে পারলেন না কেন ! উল্টো বুঝা যে স্বভাব আমাদের··· অথবা দরকার মত ব্যবহার করাও চলবে। নইলে—

বিদ্যুৎ : একটু ভুল করলে প্রদীপবাবু, এখন পরিস্থিতি অনেকটা পাল্টে গেছে, দিব্যজীবন সাধনায় আজ মর্ত্যের বুকেই জড়ের মাঝেই দিব্য সুষমা নেমে এসেছে—সব মানুষের বোধিমূলে পরোক্ষ প্রত্যক্ষ এক নতুন অভীপ্সা জেগেছে···জাগ্‌ছে। Artকে বর্জন করে নয় Artকে দিব্য জীবনের জন্যই নিয়োজিত করতে হবে। পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই যা দিব্যজীবন প্রকাশের মাধ্যম হতে পারে না। Art For the Sake of Divine Life.

শশাঙ্ক : কি বল্লেন ? শিল্প হবে দিব্যজীবনের জন্য...বাঃ কথাটা তো বেশ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ঠিক জীবন তো জীবনোত্তরণের জন্যই...সাহিত্য

শিল্প হবে তার সূচীপত্র—তাহলে তাই ঠিক, Art For the Sake of Divive Life...[বলতে বলতে আনমনা হয়ে প্রস্থান]

বিদ্যুৎ : কথাটা যখন হঠাৎ বলেই ফেললাম দেখিনা চেষ্টা করে—নাটক লিখি·· আমাদের নব আন্দোলনের সহায়ক হবে।

দৃশ্যান্তর

চতুর্থ অঙ্ক : তৃতীয় দৃশ্য

[বিদ্যুতের ঘর। বিদ্যুৎ আর শর্ম্মিষ্ঠা]

শর্ম্মিষ্ঠা : শেষ পর্যন্ত কিছু না করতে পেরে নাটকই লিখে ফেল্লে !

বিদ্যুৎ : শেষ পর্যন্ত যেমন তুমি এসে পড়লে এখানেই, যেখানে যেভাবে আসতে হবে ভাবতেও বোধ হয় নাসিকা কুঞ্চিত করতে এক কালে। তাছাড়া কিছু একটা করতে চাই বলেই নাটক লিখছি—

শর্ম্মিষ্ঠা : বুঝলাম, সাংস্কৃতিক জীবনে পরোক্ষ প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস ওৎ পেতে আছে তোমার নাটকে। কিন্তু ওতে নাটক রসোত্তীর্ণ হয় না।

বিদ্যুৎ : রস, (হাস্য) ছোট বেলায় খেলতাম—রস, কস, লিঙা, বুলবুল মস্তক···এখন তার অর্থ বুঝলাম। জাত লিঙা ফুকায় আর আমরা মস্তকে রসালু হয়ে থাকি !

শর্ম্মিষ্ঠা : Art is Better than everything !

বিদ্যুৎ : Only when it is for the Divine. অন্যথায় মানবতা বা অন্ততঃ জাতীয়তার জন্য।

শর্ম্মিষ্ঠা : তাই বলে তোমার নাটকে অহিন্দু চরিত্রের মুখ দিয়ে যে সব বক্তৃতা করিয়েছ তা আমাদের দেশের স্বাদেশিকতার ব্যঙ্গিকরণ হয়েছে। কোন মুসলমান প্রাণ খুলে বন্দেমাতরম্ বলে ভারতকে মাতৃজ্ঞানে সেবা করে ? তুমি যে চরিত্র সৃষ্টি করেছ সেতো দেখি একেবারে সনাতনী দিব্যজীবন পথিক···বন্দেমাতরমের মন্ত্রশিষ্য...এমন আকাশ-কুসুম কল্পনা বিলাস সত্যি চমকপ্রদ কিন্তু বড়ই অবাস্তব।

বিদ্যুৎ : তাহলে তুমি কি বলতে চাও···ওরা কোন দিনই ফিরবে না ? ভারতের কোটি কোটি মানুষ জীবনের মহাসত্য উপলব্ধিই করতে পারবে না ? কিন্তু দু'চার জনকে তো আমরাই জানি যারা সত্যিকারের

ভারত মাতার ছেলে! তাছাড়া বাস্তবতার ষ্টীম রোলার টেনে এনে সাহিত্য-কল্পনা-সৌধ চুরমার করতে চাও কেন? সুন্দর, সত্য স্বপ্ন হলেও সুন্দর ও সত্য; তাই শিব—শিল্পীর মনের এই তো ঐশ্বর্য···। যা হচ্ছে তা বলাই যথেষ্ট নয়—যা হতে হবে, হয়ে উঠতে হবে তাই বলতে পারাই সার্থক শিল্প কর্ম্ম।

শর্ম্মিষ্ঠা: বুঝিলাম অর্দ্ধ ঘুমন্ত এবং অর্দ্ধ জাগ্রত...

বিদ্যুৎ: না হে ভুল করিলে। শিল্প-কল্পনা ঘুমের কল্পনা নয়। (থেমে) জীবন হলো যজ্ঞ, আমরা অপূর্ণ সব মানুষ তার মধ্যে আহুতি মাত্র। তত্ত্ব নয় এ আমাদের কাছে বিরাট সত্য। জন্মাবধি আমরা মায়ের কাছে বলি প্রদত্ত। যে সব ভাল কথা এতকাল সাহিত্যে তত্ত্ব হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে আজ তা বাস্তব জীবনে গ্রহণ করতে হবে।

শর্ম্মিষ্ঠা: কবে?

বিদ্যুৎ: বুঝতে পারছো না? যে দিন থেকে তুমি সিংহল্লী আর তথাকথিত বালিগঞ্জ কাল্‌চার ছেড়ে এসেছ সেইদিন থেকেই সে কাজ শুরু হয়েছে তোমার জীবনে। সামগ্রীকতায় খণ্ড হিসাবে ব্যক্তি বর্জিত নয়...আশার কথা সমষ্টি সংগঠনের প্রতিভূ হয়ে ব্যক্তি চেতনা আজ জগতে কর্ম্মরত...তাঁর কৃপা পাবই।

শর্ম্মিষ্ঠা: উঃ কি আশ্চর্য পরিবর্ত্তন! কি ছিলে আর কি হয়েছ!!

বিদ্যুৎ: কি ছিলাম?

শর্ম্মিষ্ঠা: অন্ততঃ জীবন-শিল্পী ছিলে!

বিদ্যুৎ: ভগবৎ-শিল্পী হতে চেষ্টা করছি, চাইছি জীবনোত্তরণ। প্রথম যৌবনের উন্মাদনায় খবর তোমার অজানা নয়। সুন্দরের যে সীমানা টানা আছে তখন তা জানিনি। ব্যর্থপ্রেম, বেচারত্ব, আদর্শহীনতা আমাদের দেশের অনেক তরুণ তরুণীর জীবনেই ঘটে তাই বলে তাকে সর্বার্থক ভাবা যায় না···সেও এক বোকামী। কাঁচা মনের অনেক ভোগান্তি হয় শর্ম্মিষ্ঠা। জন্মগ্রহণ, বেঁচে থাকা···প্রত্যেকের জীবনেই তার সার্থকতা আছে। যে কোন আবেষ্টনীতেই যে কেউ পড়ুক—সচেতন হলে অনায়াসে বুঝতে পারবে উত্তরণের পথ নির্দ্দিষ্ট। এক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়ে ভাবাবেগে ভারতের মহাতাপসের আদর্শ গ্রহণ করলাম। মন কাঁচা হঠাৎ পেলাম দারুণ আঘাত। ধর্ম্ম, সত্য ন্যায়ের নামাবলির অন্তরালে কি

বীভৎস আদিমতা—সত্যের ভিত্তি টলে উঠলো আমার : তাহলে কি সত্য শুধু 'কথার কথা'? স্বার্থান্বেষণে, মিথ্যাচারে লাম্পট্যেই শেষ পর্যন্ত জয়!! [উঠে পায়চারি করে]

লতিকার বন্ধুত্বের আহ্বানে সাড়া দেওয়া তখন আমার বড় আশ্রয় হলো শর্মিষ্ঠা। লতিকাকে ভালবাসতুম।

তবু সে ভালবাসার মূল্যায়ণ অন্তভাবে করা ছিল আমার মনে। মন আগুনে পুড়লো। মন প্রায় নিখাদ হলো। নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে জৈবিক জীবনের উর্ধ্বায় স্তরে স্তরে বুঝলাম : বুঝলাম—ভগবানের পথ শাশ্বত সনাতন। মানুষ যে যে ভাবেই যেখানে থাকুক তারই মহিমায়, বৈভবে তারা আত্মগোপন করে আছে মাত্র। আসলে একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছ—প্রকৃতপক্ষে সব মানুষই সত্য শিব সুন্দরের পূজারী। প্রকাশ্যে সবাই ভাল বলেই জাহির করতে চায় নিজেকে—লুকিয়ে যে যাই করুক। আসলে মিথ্যাচার, ব্যাভিচার এ সবকে তারা চায় না। সত্য অবাস্তব নয়।...আবার ফিরতে হলো আমাকে। ফিরতে হবে সবাইকেই। বহু পথ, লক্ষ্যদ্বয় এক—বৈচিত্র বিভ্রান্তে কর্ম্মের আগুনে ভস্মীভূত হয়ে শুদ্ধ 'অহং' নবজীবনের যুগ সঞ্চার করবে। জীবনোত্তরণ অবশ্যম্ভাবী।

শর্মিষ্ঠা : বেশ figurative বক্তৃতা করতে পারতো, ভাল লাগলো। কিন্তু তোমার নাটকে খৃষ্টান চরিত্র বোধ হয় নাও নি।

বিদ্যুৎ : ওদের জন্যে আলাদা করে ভাবছি—সংক্ষেপে বক্তব্য বলা ঠিক হবে না। এখনও কলকাতা শহরে কলকাতা কেন, সারা ভারতে খৃষ্টান মিশনারীদের ছলে বলে কৌশলে ধর্ম্মান্তরিত করার কত ফন্দি ফিকির চলেছে।...এক সময়ে আমার মনে হতো কি জান? মনে হতো ধর্ম্ম-মন্দির, মস্‌জিদ, গীর্জ্জা সব ধূলিসাৎ করে ফেলা যায় না কি?...কিন্তু এখন বুঝছি...অন্তভাবে মূল ভাবের চাবিকাঠি পেতে হবে...এবং তাতে করেই সব বাঁধা সব ধাঁধা উবে যাবে। ভগবানের শাশ্বত পথে আমরা এগিয়ে যাব।

শর্মিষ্ঠা : আশা করতে ইচ্ছা করছে তোমার আশাতীত দিনের কিছু সোনালি স্বপ্ন কি সার্থক হবে?

বিদ্যুৎ : হবে যদি সার্থক ভাবেই স্বপ্ন দেখতে পার। স্বপ্ন অলীক নয়...স্বপ্নের প্রভাব জীবনে ব্যাপক...দুঃস্বপ্ন যেমন বিপত্তি ঘটায় জীবনে, সুস্বপ্ন তেমনি আনতে পারে সৌষম্য, প্রতিষ্ঠা। আসলে কি জান, সবই

হচ্ছে স্বপ্ন ; মানসিকতার সমগ্র পরিমণ্ডলই বাস্তবতার প্রকাশ ঘটায়। মনের অন্তস্থল পর্যন্ত ঢুকতে পারলে দেখতে পাবে, যা ঘটে বাইরে তার সব সম্ভাবনার বীজ গভীরে সংগুপ্ত রয়েছে। ঐকান্তিক চাওয়া ব্যর্থ হয় না বিফল হতে পারে না। সেই মানসিক পরিমণ্ডল শক্তি···গড়ে তোলাই আজকের সবচেয়ে বড় কাজ।

শর্মিষ্ঠা : আরে cosmopolitan বিমূর্তি যে !

(ডেভিড ও রমতাজের প্রবেশ)

ডেভিড : Now with you it is Trinity !

বিদ্যুৎ : দেখলে তো শর্মিষ্ঠা, তুমি অস্থির হয়ে পড়ছিলে—ভাবছিলে নাটকে আমি গোল্লা মিল দিচ্ছি !

রমতাজ : মনে মনে হিন্দুরা ঐক্যের বাস্তব কল্পনা করতে ভয় পায়। একাত্মতা কি করে সম্ভব হবে ভেবে পায় না। আসলে spiritualityই একমাত্র পথ ; সর্বধর্ম সমন্বয় নয়—সব ধর্মই এতকাল দিব্য সত্যকে ধারণ করে আজকে আমাদের উপহার দিয়েছে জীবনে প্রয়োগ করতে।

ডেভিড : And It can only be done by being truly like a child in the hands of the Divine Mother !

শর্মিষ্ঠা : বিদ্যুৎবাবু, সত্যি তোমরা ভাবিয়ে তুলেছো।

বিদ্যুৎ : তুমিও অমনদের ভাবাবে...আগে এসে পড় কায়মন বাক্যে। হয়তো ইতস্ততঃ সব ত্যাগ করে এসো ঝাঁপিয়ে পড়ি।

শর্মিষ্ঠা : কবি শশাঙ্কবাবু বলেন, দল বেঁধে ভাল করতে গেলে আসল ভাল দলা পাকিয়ে যায়···বিকৃত হয়।

বিদ্যুৎ : বিকৃত সমাজেরই অবশ্যম্ভাবী সংস্থা এ 'দল'—বিকৃত দোষ থেকে তার সৃষ্টি আর বিকৃত দূরীকরণে তার অবলুপ্তি আর তার পরিণতি ; অবলুপ্তিই তার সার্থক পরিণতি। আমাদের লক্ষ্য তো দল নয়, লক্ষ্য 'হয়ে ওঠা', হতে দেওয়া—নারায়ণী সেনা চাইনা আমরা, আমরা চাই নারায়ণকে। অবশ্যম্ভাবী কুরুক্ষেত্রে চল নির্ভয়ে এগিয়ে যাই। কুরুক্ষেত্র মনে প্রাণে, দেহের কোষে কোষে, রক্তের কণায় কণায়···ভাবে ভাবনায় কর্মে ধর্মে···প্রয়োজনে স্থূল বাস্তবেও। বন্দেমাতরম্।

: দৃশ্যান্তর :

চতুর্থ অঙ্ক : শেষ দৃশ্য

[প্রদীপদের পার্টি অফিস। প্রদীপ উমাকান্ত ও রমতাজ।]

উমা : তাহলে বিদ্যুতের কুরুক্ষেত্র নাটক দিয়েই শুরু করবো আমরা, সাংস্কৃতিক জীবনে তাহলে একটা আলোড়ন উঠতে পারে।

প্রদীপ : কিন্তু কুচক্রীর দল শেষ পর্যন্ত কি করে দেখুন—নাটকটি যখন বুদ্ধিমান বিভাগ থেকে পড়তে চেয়ে পাঠিয়েছে, তখনই আমার ভয় হয়েছে।

রমতাজ : কিন্তু একটা কিছুতো করতে হবে? দল গড়া হল, বক্তৃতাও কম হল না...কিন্তু তেমন তো কিছু সফলতা বাস্তবে দেখছি না, এরপর আমরা কি মিষ্টিক, লোকের কাছে উন্মাদ হয়ে উঠবো না?

প্রদীপ : অতো সহজে সত্যাবোহণ হয় না ভাই! সাধকের মন নিয়ে এপথে আসতে হবে···ক্ষণভঙ্গুর নশ্বরতার মধ্যে সত্যকে পাবে কোথায়? অন্তরের অন্তস্থলে ডুব দাও, অরূপ রতন পাবে। দিব্য জীবনের স্বাদ পেয়ে বাস্তব তখন মহাসত্যময় হয়ে উঠবে। [কাছে গিয়ে কাঁধে হাত রাখলো]

[আত্রেয়ীর প্রবেশ]

আত্রেয়ী : "বন্দেমাতরম্"—বন্ধুগণ...ভাইরা—খবর শুভ...বিদ্যুতদার "কুরুক্ষেত্র" নাটক অভিনয়ে সরকার সম্মত হয়েছেন।

সকলে : হুররা—"বন্দেমাতরম্"

উমা : এবার তাহলে মহড়া শুরু করা যাক্, নাটকটা দাঁড় করানো যাক—(লতিকার প্রবেশ)

লতিকা : জীবনটাই তো নাটক উমাবাবু, কিসের নাটক করছেন আপনারা জীবনকে ব্যঙ্গ করে?

আত্রেয়ী : লতিকাদি, কি বলছেন আপনি?

লতিকা : ঠিকই বলছে ভাই, আর আমি পারছি না; অসহ্য অসহ্য জীবনকে ব্যঙ্গ করে যাচ্ছ তোমরা, আর তার প্রধান নায়ক তোমাদের বিদ্যুৎ।

[বিদ্যুতের প্রবেশ]

বিদ্যুৎ : তুমিই না সেদিন ক্ষমা চাইবার সুযোগ চেয়েছিলে?

লতিকা : ভাবের ঘোরে। জানো তো ভাবের ঘোরে, বক্তৃতার দাপটে অনেক কিছুই করা যায় ; কাপুরুষও বীর হয়, অধার্মিকও হয় ধার্মিক।

বিদ্যুৎ : আবার তেমন ভাবে পড়লে ভাল মানুষ অমানুষ হয়, ধার্মিক অধার্মিক; হয় বীর হয় কাপুরুষ।

লতিকা : ঘরে বাইরে আজ আমার কোন ঠাঁই নেই...এ জেনেই তুমি আমায় অপমান করছো না-কি ?

বিদ্যুৎ : ভুল আমরা সকলেই করছি কারণ জীবনটাই বিকৃত অস্তিত্ব মাত্র কিন্তু তাই বলে জীবন উত্তোরণকে ভুলতে পারি না। লতিকা, মান-অপমান অন্তভাবে দেখ।

লতিকা : কোথায় তুমি যেতে চাও ?

বিদ্যুৎ : কোথাও না—এখানে থেকেই হয়ে উঠতে চাই। আত্রেয়ী, তোমার মনে আছে, কাকীমার শ্মশানের আগুনের ঝলকে ঝলকে আমাদের কি মনে হয়েছিল ? মনে হয়েছিল, মৃত্যুই তো আমাদের স্মরণ করায় এ জীবনের হাসি কান্না লোভ বাসনার মিথ্যা ধাঁধাঁকে···কিন্তু আজ আর না; এবার এগিয়ে যাবার পালা। তোমার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক—তা কিসের ? আসলে কিন্তু সবাই আমরা দিব্য জীবনের আলোতে সম্পৃক্ত।

[উমা বাবুর প্রস্থান]

লতিকা : হেঁয়ালী দিয়ে পালিয়ে যেতে চাইছো, কিন্তু জানতো "পালাবার পথ নাই যম আছে পিছে—"

বিদ্যুৎ : তাই তো বলি যমকে, নিয়মকে পরাজিত করার মাহেন্দ্রক্ষণ এখন উপস্থিত। লতিকা, জানিনা কিসের প্রভাবে তুমি আজ বিরুদ্ধ শক্তি হয়ে এলে !

আত্রেয়ী : বিরুদ্ধতা আমাদের শক্তিকে বাড়িয়ে দেবে বিদদ্‌।

বিদ্যুৎ : সে আমি মানি, জানি কি নিদারুণ সংকটে লতিকা পড়েছে, কি অদ্ভুত ভাবে সে উঠে আসছে আলোর পথে, আলো হাতে, বরাভয় নিয়ে।

লতিকা : বি—দ্যু—ৎ !

বিদ্যুৎ : লতিকা। (কাছে গিয়ে কাঁধে হাত রেখে) লতিকা—

লতিকা : তাই হোক বিদ্যুৎ, জীবন হোক সত্য, জীবন হোক দিব্য, আমার এ প্রেতমূর্তী পুড়ে ছাই হোক—আমার পুনর্জন্ম ঘটুক।

বিদ্যুৎ : শুধু তুমি নও, পরিবার নয়, গোষ্ঠী নয়, দেশ নয়, বিশ্বময় সেই মহাশক্তির বাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হোক।

প্রদীপ : স্বাদেশীকতা মুক্ত হোক—মুক্ত হোক দিব্য-জীবনানন্দ। Art হোক দিব্য শক্তিরই বাহন। নীচে থেকে আহ্বান আর উর্দ্ধের অনুমতি—

রমজান : আর মায়ের কাছে বিনা বাধায় বিনা কুণ্ঠায় আত্মসমর্পণ কোরবাণী।—(করজোড়)

আত্রেয়ী : মর্ত্ত্য হবে স্বর্গ, মানুষ হবে দেবতা, জগন্নাথের রথ নামবে মাটির ধূলোয়—কবির স্বপ্ন বাস্তব হয়ে জীবন হবে অমৃত।

(সাদিকের অখণ্ড ভারতের মডেল নিয়ে প্রবেশ)

প্রদীপ : (জড়িয়ে ধরে) সাদিক, ছাড়া পেয়েছে ভাই ?

সাদিক : হ্যাঁ দাদা, ছাড়া পেয়েই ছুটে এসেছি।

প্রদীপ : দেখ—দেখ আমারা তোমার বিশ্বাসভাজন হতে পেরেছি, অনেক কিছু ঘটে গেছে...তোমার রক্ত জল করা অর্থে ভগবানের সেনা-দল গড়ে উঠেছে...দিব্য সত্য উচ্চারিত...তুমি যে এসে পড়েছো মাকে তার জন্য ধন্যবাদ।

সাদিক : কে আর আমায় ধরে রাখবে দাদা ? বন্ধন তো মনের, সেই বন্ধনই যখন তীব্র হয়, বাইরেও তা এসে পড়ে...ক্ষুদ্র কারা কুটীরে বসে হঠাৎ আমি যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছি···নমস্কার ভাইসব।

বিদ্যুৎ : নমস্কার নয় কোলাকুলি [আলিঙ্গন] হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, নয় কোন ধর্ম্ম···সব আমরা মানুষ, এক দিব্য মায়ের সন্তান।

নেপথ্যে উদাত্ত কণ্ঠে : আলো—আলো—আলো, চির অচেনা আজ গেল জানা। দিব্যজীবন নামছে জগতে। মা, আমাদের প্রণাম নাও। নূতন জীবন ধারণ করার, ব্যবহার করার শক্তি দাও। সারা দুনিয়ার নবজীবনের বৈতালিক দলকে আশীর্ব্বাদ করো।

নেপথ্যে গান

আজ নিখিলের অন্তরে উঠছে যে গান মধুরে
সকল বাধার অবসানে দিব্যজীবন আসিছে।
ওরে মানুষ ভাই, কান পেতে শোন ভাই—

এগিয়ে চল এগিয়ে চল নূতন উষাতে।
দুয়ার আছে খোলা, আয়রে পথ ভোলা
অচেনারে অদেখারে গেছে যে আজ জানা
নূতন যুগের হয়েছে ভোর, নূতন সূর্য উঠিছে।

[উপর দিক থেকে একটি আলোক রেখার দিকে সকলে তাকালো। তারপর ছেলেরা পরস্পর প্রথমে করমর্দন ও পরে কোলাকুলি করলো। মেয়েরা হাত ধরাধরি করে দাঁড়ালো। গান থেমে গেলে আলোর দিকে তাকিয়ে সমবেত ভাবে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিল।]

যবনিকা

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাংলা দেশের বিভিন্ন সৌখিন নাট্য-সম্প্রদায়কে 'কুরুক্ষেত্র' মঞ্চস্থ করতে সাধ্যমত আমরা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। নাটক পরিচালনার ব্যাপারে কিছু জ্ঞাতব্য আছে, অনুরোধ করবো তাদেরকে সে সব জেনে নিতে।

—সম্পাদক, 'জাগরী'

অভিশপ্ত গৃহ

(দিল্লীর ডায়েরী থেকে)

দেবজ্যোতি বর্ম্মণ

একটিমাত্র চিঠি শোকসংবাদ এবং আনন্দবার্ত্তা একই সঙ্গে বহন করিয়া আনিতে পারে ইহা সেইদিন সে প্রথম জানিল। চিঠি আসিয়াছে—মামার মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহাকেই তিনি সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী করিয়া গিয়াছেন। মামা তাহাকে প্রাণাধিক ভালবাসিতেন। সম্পত্তির তাঁর কম ছিল না। ব্যাঙ্কে আছে ২০ লক্ষ নগদ টাকা এবং সহরের উপর আছে একটি প্রকাণ্ড বাড়ী, তাহাতে ২৩টি ফ্লাট। বাড়ীটি তিনি বহুদিন আগে কিনিয়াছিলেন তিন লাখ টাকায়, এখন উহা হইতে বার্ষিক যে ভাড়া ওঠে ট্যাক্স বাদে তাহা হইতে থাকে ৮২ হাজার টাকা।

বসিয়া বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল—এটা ঠিক নয়, মামা বাড়ীতে ভাড়া দারুণ ভাবে বাড়াইয়াছেন, ভাড়াটের রক্ত শুষিয়া এত টাকা সঞ্চয় করিয়াছেন, ইহাকে লুণ্ঠন বলিয়া অভিহিত করাই উচিত। আমি কালই ভাড়া কমাইয়া দিব। ভাড়াটেরা আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে।

ডাকিয়া পাঠাইল বাড়ীর ম্যানেজারকে।

—ম্যানেজার, এখনই যাও, ভাড়াটাদের গিয়া বল আমি তাহাদের ভাড়া তিনভাগ কমাইয়া দিলাম।

'কমানো' শব্দটা ম্যানেজারের মাথায় যেন ইটের মত আসিয়া পড়িল। খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—হুজুর, তবে আমার সঙ্গে তামাসা করিতেছেন? কমানোর আদেশে কি আপনি বিপরীতার্থে প্রয়োগ করিতেছেন? ভাড়া কিন্তু আর বাড়ানো যাইবে না।

—আমি জীবনে কখনো এর চেয়ে সিরিয়াস কথা বলি নাই। যাও, গিয়া ভাড়া কমাইবার আদেশ ভাড়াটেদের জানাইয়া দাও।

ম্যানেজার এবার দস্তরমত ঘাবড়াইয়া গেল। বলিল—হুজুর, বাড়ীর ভাড়া বাড়ে না, কমে, একথা কোন লোক কোন সময় শোনে নাই। ভাড়াটেরা এবং পাড়ার লোক এই অসম্ভব আদেশ শুনিলে যে আপনাকে পাগল বলিবে।

—আমার আদেশ পালিত হইবে ইহাই আমি চাই, তর্ক শুনিতে আমি রাজি নই।

ম্যানেজার মাতালের মত টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল। ভাবিতে ভাবিতে চলিল···ভাড়া কমিবে, ভাড়া কম হইবে, ইহাও বিশ্বাস করিতে হইবে? ভাড়াটেরা তো কেহ কোন অভিযোগ করে নাই? মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রত্যেকে ভাড়া দিয়া দেয়, একজনও বাকি রাখে না, দেরীও করে না। তবে এদের ভাড়া কমাইবার কি কারণ? নিশ্চয় তবে নূতন মনিবের মাথা খারাপ হইয়াছে।

ম্যানেজার বাড়ী ফিরিলে তার ফ্যাকাসে মুখ দেখিয়া পত্নী এবং কন্যা একই সঙ্গে বলিয়া উঠিল—কি ব্যাপার, কি হইয়াছে, তোমার এই চেহারা কেন?

—না, কিছুই হয় নাই, বলিয়া ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িল। গলার স্বরও তার বদলাইয়া গিয়াছে।

—গোপন করিও না, বল কি হইয়াছে। নূতন মনিব কি আমাদের তাড়াইয়া দিতে চায়?

—তাহা হইলেও তো বুঝিতাম। কিন্তু সে আমাকে যাহা বলিয়াছে, নিজের মুখে যাহা বলিয়াছে—

—থামলে কেন, বল।

—শুনতে চাও? তবে শোন। মনিব আমাকে আদেশ দিয়াছেন বাড়ীর প্রত্যেক ফ্ল্যাটের ভাড়া তিনভাগের একভাগ কমিবে এবং এই সংবাদ ভাড়াটেদের এখনি জানাইতে হইবে। শুনিয়াছ, ভাল করিয়া শুনিয়াছ? ভাড়া বাড়িবে না, তিনভাগের একভাগ কমিবে।

পত্নী এবং কন্যা হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

—ভাড়া কমিবে? কি আশ্চর্য্য কথা! লোকটা তো রসিক আছে, বেশ তামাসা জানে। ভাড়াটেদের ভাড়া কমিবে?

ম্যানেজার বলিল—সিরিয়াস ব্যাপারে হাসি ভাল লাগে না।

পত্নীও রুখিয়া উঠিল—সব বুঝিয়াছি। আদেশটা তুমি মনিবের নিকট হইতে পাও নাই, বোতোরাঁয় ঢুকিয়া বোতলের গলা হইতে আনিয়াছ।

প্রকৃত ঘটনা যাচাই করিতে পত্নী নিজেই ছুটিল মনিবের বাড়ী। মনিবকে বলিল—হুজুর, সবই শুনিয়াছি। কিন্তু আমরা গরীব মানুষ। আপনার এত বড় আদেশ আমরা জানাইতে গেলে কেহ বিশ্বাস করিবে না। আপনি একটু লিখিয়া দিন। ইহাতে আমাদেরও দায়িত্ব কমিবে।

মনিব আদেশ লিখিয়া দিল।

পত্নী ফিরিয়া আসিলে তিনজন বৈঠকে বসিল।—কি করা যায়? লোকটা পাগল হইয়াছে ইহা তো বোঝাই গেল। কিন্তু পাগলের হুকুম তামিল করিয়া তাহারা বিপদে পড়িবে না তো?

ম্যানেজার এতক্ষণে শক্ত হইল। বলিল—যা থাকে কপালে, আদেশ পালন করিতে হইবে।

পরদিন সকালে ম্যানেজার তেইশটি ফ্ল্যাটের সব ভাড়াটেকে নূতন মনিবের নূতন আদেশ জানাইয়া আসিল।

দশ মিনিটের মধ্যে যেন সারা বাড়ীটায় এক তুমুল উত্তেজনার সঞ্চার হইল। চল্লিশ বছর পাশাপাশি ফ্ল্যাটে বাস করিয়াও যাহারা পরস্পরকে দেখিয়া কথা বলা তো দূরের কথা, মুখখানা একটু হাসি হাসিও করে নাই, তাহারা এক মিনিটে যেন পরমআত্মীয় হইয়া গেল। সুরু হইয়া গেল আলোচনা—

—মশাই, শুনেছেন ?

—শুনেছি। ব্যাপারটা বড়ই আশ্চর্য্যজনক।

—এ রকম কথা কেহ কখনো শোনে নাই।

—মনিব আমার ভাড়া কমাইয়া দিয়াছেন।

—আমারও, তিন ভাগের একভাগ ভাড়া কমিবে।

—আমার কিন্তু মনে হইতেছে কোথাও নিশ্চয়ই একটা কিছু ভুল হইয়াছে।

একদল ভাড়াটে আবার ম্যানেজারের নিকট গিয়া জানিতে চাহিল সত্যই কথাটা সত্য কি না।

ম্যানেজার মনিবের লিখিত আদেশ দেখাইল। ভাড়াটেদের সন্দেহ তবু গেল না।

তিনজন ভাড়াটে মনিবকে চিঠি দিল—ম্যানেজার তুমা গুজব রটাইতেছে, ম্যানেজারের মাথা খারাপ হইয়াছে।

মনিব জবাবে লিখিল—ম্যানেজারের মাথা ঠিকই আছে, সে ভুল খবর দেয় নাই।

ভাড়াটেদের জল্পনা এবার অন্য পথ ধরিল।

—আচ্ছা, মনিব তার বাড়ীভাড়া হঠাৎ কমাইতে গেল কেন ? কি এর কারণ ?

—ঠিক, এর কারণ জানা দরকার। যে বাড়ীওয়ালা নির্ব্বিবাদে মোটা ভাড়া তুলিতেছে, কেহ কোন আপত্তি করে নাই, সে হঠাৎ ভাড়া কমাইতে যায় কেন ? খুব বড় রকমের কারণ না থাকিলে বা খুব বিপদে না পড়িলে এরূপ অসম্ভব কাজ কেহ করিতে পারে না।

প্রত্যেক ভাড়াটে ভাবিতে লাগিল—নিশ্চয়ই এই ভাড়া কমানোর ভিতরে কোন রহস্য আছে।

এইবার মুখে মুখে প্রশ্ন ফিরিতে লাগিল—কিন্তু সে রহস্যটাই বা কি ?

একজন বলিল—এই লোকটা নিশ্চয় কোন জঘন্য অপরাধ করিয়াছে। ধরা পড়ে নাই কিন্তু বিবেকের দংশন অনুভব করিতেছে। এই জন্যই একটা সৎকাজ দেখাইয়া নিজের বিবেককে সান্ত্বনা দিতে চায়।

—তাহা হইতে পারে, কিন্তু এই জাতীয় একটা রাস্কেলের বাড়ীতে বাস করাও বিপজ্জনক হইয়া উঠিতে পারে। এখন না হয় বিবেকের দংশন

চলিতেছে, কিন্তু উহা কাটিয়া গিয়া আবার অপকর্ম্ম সুরু করিলে—তখন কি হইবে ?

—এও তো হইতে পারে যে, বাড়ীটা খুব খারাপ মসলা দিয়ে তৈরি ?

—হুঁ. তাবটে। জোর করিয়া কিছুই বলা যায় না। কিন্তু একথা ঠিক যে, বাড়ীটা ভয়ানক পুরানো।

—ঠিক ঠিক, গত বছরে যখন বাড়ীর ড্রেন মেরামত হয় তখন দেয়ালে কাঠের ঠেক্‌নো দিয়াছিল, ইহা আমি নিজে দেখিয়াছি।

—হয়ত বাড়ীটার ছাদ খারাপ হইয়া গিয়াছে, যে কোন সময়ে ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে।

আর এক ভাড়াটে খুব বিজ্ঞের মত বলিল—হুঁ, আর একটা কথা। বাড়ীটার মধ্যে একটি গুদামঘর আছে জান তো ? সেখানে বোধ হয় একটা নোট জালের কারখানা আছে। রোজ রাত্রে ফিস ফাস্ ধুপ ধাপ্ শব্দ শুনি।

—আমার কিন্তু মনে হয়, এই বাড়ীতে একটি রাশিয়ান গোয়েন্দা আসিয়া বাস করিতেছে।

—আরে তোমরা কেউ কিচ্ছু বোঝে না। আমি এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলাম। এখন আসল ব্যাপারটা বলিতেছি। মনিব নিশ্চয়ই বাড়ীটাকে মোটা টাকায় ইনসিওর করিয়াছে, বাড়ীতে আগুন দিয়া ঐ টাকাটা আদায় করিতে চায়। আমরা প্রাণে বাঁচিলেও আমাদের সর্ব্বস্ব পুড়িয়া ছাই হইবে।

ইহার পর সুরু হইল প্রতি রাত্রে ভাড়াটেদের বিভীষিকা দর্শন। এক বুড়ী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—আমি কাল রাত্রে চার তলায় গিয়াছিলাম। দেখি কি, আমাদের আগের মনিবের ভূত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমার সামনে ভাড়ার রসিদটা বাড়াইয়া দিতে আমি তাহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিলাম।

একতলা হইতে ছয়তলা পর্য্যন্ত প্রত্যেক ভাড়াটের মুখে একটিমাত্র কথা —ব্যাপারটার ভিতর নিশ্চয় কিছু আছে।

সংশয় এবং ভয় ক্রমে আতঙ্কে পরিণত হইল। এক ভাড়াটে বাড়ী ছাড়িবার নোটিশ ম্যানেজারকে পাঠাইয়া দিল। ম্যানেজার উহা মনিবকে দিয়া দিল।

—ঠিক আছে, যেকুব যাইতে চায়, থাক।

তারপর দুইজন, তারপর তিনজন, এই ভাবে প্রতি সপ্তাহে ভাড়াটেদের বাড়ী ছাড়ার নোটিশ আসিতে লাগিল। যাহারা রহিল তাহারা রাত্রে বাড়ী পাহারার ব্যবস্থা করিল। ঝি চাকর বেশীর ভাগ পলাইল। যাহারা রহিল তাহারা তিনগুণ বেতন দাবী করিল।

একটি করিয়া নোটিশ আসে আর ম্যানেজারের পত্নী বলে—না, এটা একেবারেই স্বাভাবিক নয়।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ২৩টি ফ্লাটেই টু লেট ঝুলিল।

নূতন মনিব ম্যানেজারের নিকট শেষ ভাড়াটের প্রস্থানের সংবাদ পাইয়া বলিল—অপদার্থেরা দূর হউক, নূতন ভাড়াটে দেখ।

নূতন লোক আসে। ম্যানেজার সকলকে বাড়ী দেখায়। তাহারা জিজ্ঞাসা করে—এত বিরাট বাড়ীর সবটা খালি কেন?

ম্যানেজার শুধু বলে—এখানে একটা খুব আশ্চার্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছে। বাড়ীর মালিক ভাড়া কমাইয়া দিয়াছেন।

নূতন লোকেরাও তখন সরিয়া পড়ে।

খালি বাড়ীর ইঁদুরগুলিও অনশনে মৃত্যুর আশঙ্কায় পাশের বাড়ী চলিয়া গেল।

বাড়ীর সামনের কোয়াটারে ম্যানেজার পরিবার রহিল একা। রাত্রে খালি বাড়ীর দিকে চোখ পড়িলে তাদেরও দাঁতে দাঁত ঠেকে, মাথার চুল খাড়া হইয়া ওঠে। পত্নীর ঘুম ছুটিয়া গেল। প্রতি রাত্রে অনিদ্রায় তার চেহারা অর্দ্ধেক হইয়া গেল। কন্যার সখ ছিল সিনেমা ষ্টার ছাড়া কাহাকেও বিবাহ করিবে না। বাড়ীতে বাস করার ভয়ে বাপ-মার অজ্ঞাতে সে এক নাপিতকে বিবাহ করিয়া সরিয়া গেল। এই যুবকটিকে অল্পদিন আগেও সে সহ্য করিতে পারে নাই।

ভয়ে অনিদ্রায় জীবনধারণ অসম্ভব বুঝিয়া ম্যানেজার একদিন প্রভাতে বাড়ীর চাবি মনিবের হাতে দিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

বাড়ীটি এখনও খালি আছে। লোকে উহার নাম দিয়াছে—"অভিশপ্ত গৃহ"। সারাটা বাড়ী ধুলায় ভর্ত্তি, উঠানে বড় বড় ঘাস আর জঙ্গল। আর কোন ভাড়াটে আসে না। চার পাশের অন্য বাড়ীগুলিরও দাম কমিয়া গিয়াছে।

বাড়ীভাড়া কমে! ইহাও কি লোকে ভাবিতে পারে!!

সৎকাজ নিঃস্বার্থ হয়, ইহাও কি সম্ভব?

যন্ত্রণার কবি সুধীন্দ্রনাথ

সরলকুমার ঘোষ

[কবি সুধীন্দ্রনাথ যেন ভারত-সংস্কৃতির নির্ভুল প্রতিনিধি। তাঁর ব্যক্তিত্বে বৈষম্যের মধ্যে সাম্যের, অখণ্ডের অনায়াস প্রকাশ। অন্যদিকে সমকালীন মানুষের 'যন্ত্রণা'কে কবি তাঁর কাব্যে রূপায়িত করেছেন। তাই তিনি 'যন্ত্রণার কবি'।]

সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বে আপাত-বিরোধী উপাদানের বিস্ময়কর সমাবেশ দেখতে পাই। কাশীতে নিয়েছেন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ। প্যারিস করেছে তাঁর মননকে দীপ্ত। সনাতন ভারতবর্ষ ও বিংশ শতকের ইউরোপ—উভয়ের সংগে তাঁর পরিচয় নিবিড় ও আত্যন্তিক। উত্তরসূরী হিসাবে পেয়েছেন উপনিষদের ভাবধারা। আবার Descartes বা Spinoza-কে মেনে নিতেও তাঁর অসুবিধা হয়নি। মহাভারতের মধ্যে পেয়েছেন যেমন উপমা-অলংকার ও আলেখ্য-প্রাচুর্য্যের সন্ধান, গ্যেয়টে তেমনি তাঁর অন্যতম প্রিয় সাহিত্যিক-দার্শনিক। তাঁর কবিতা-প্রাণ যেমন মৌল ও ব্যক্তি-কেন্দ্রিক, রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর ঋণ তেমনি অনস্বীকার্য্য। অবশ্য ঋণের মাত্রা একটু বেশি হয়ত ম্যালার্মের কাছে। জন্ম-অভিজাত পরিবারের তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তি। আবার সমকালীন সামাজিক সমস্যা থেকে তিনি দূরে থাকতে পারেন নি। মন ও মননকে নাড়া দিয়েছে আভিজাত্যের শুচিশুভ্র প্রবতা সত্ত্বেও। সুধীন্দ্রনাথ যেমন সংস্কার-পন্থী, তেমনি আবার তিনি প্রগতি-মূলক চিন্তাধারার উদ্গাতা ও নেতাও। "পরিচয়ে" তাঁর এই পরিচয় প্রথম মিলবে। কবি সুধীন্দ্রনাথ পাঠক-সমাজে প্রায় দুর্বোধ্য। মানুষ সুধীন্দ্রনাথ সহজ, সরল অমায়িকতার মূর্ত প্রতীক। তাই বলছিলাম, সুধীন্দ্রনাথ যেন ভারত-সংস্কৃতির নির্ভুল প্রতিনিধি। তাঁর ব্যক্তিত্বে বৈষম্যের মধ্যে সাম্যের, অখণ্ডের অনায়াস প্রকাশ। বুদ্ধি ও বোধি, কর্ম ও চিন্তার একটি শিল্পময় সম্মিলনের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসই সুধীন্দ্রনাথের কবি-মানসের মূলকথা। এলিয়ট ও সুধীন্দ্রনাথে প্রায়ই তুলনা করা হয়। স্বভাবে দু'জনই কবি ও সমালোচক। উভয়ই 'ট্র্যাডিশনে' বিশ্বাসী—তাই তাঁরা বিশ্বাস করেন : যুগবাহী ভাবধারা সাহিত্যকে করে পরিপুষ্ট ও বিচিত্র। এমনি করেই সাহিত্য সাবালক হয়ে ওঠে। সাহিত্য নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলছে। জীবন যেমন থেমে নেই, জীবনের রূপায়ণে সাহিত্য তাই এগিয়ে চলে যুগের পদক্ষেপের

সংগে—যুগের অমেয় ভাবধারার পলিমাটিতে উর্বর হয়ে। আবার উভয়েই যুগবাহী ভাবধারা ও অতীতের সর্বজন-স্বীকৃত সনাতনী মতবাদের সারবত্তার মূল্যায়ণ করেছেন পরিবর্তিত পটক্ষেপে। কারণ তাঁরা জানেন, বিশুদ্ধ, নির্বস্তুক জ্ঞান নিরর্থক। সমকালীন ভাব-তরংগে উদ্বেলিত না হলে সে তো প্রতিক্রিয়াশীলতার নামান্তর। সাহিত্যের ট্র্যাডিশন গড়ে ওঠে নিছক যুগ-সঞ্চিত জ্ঞানপুঞ্জ থেকে নয়—রাগ্রত-জীবনের প্রত্যক্ষগম্য আন্তরিকতা থেকেই সেই ট্র্যাডিশনের সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি।

জীবনের উদ্দেশ্য আর অর্থ সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন না দ্বিধান্বিত। তবু তো তিনি জানতেন, প্রতিকূল পরিবেশের মাঝেই এই জীবনকে আমাদের বরণ করতে হবে, যেখানে হয়ত আশা শুধু মিছে ছলনা, অনিশ্চয়তার গাঢ় ছায়া যেখানে প্রসারিত। তাই বলে তিনি নৈরাশ্যকে প্রশ্রয় দেন নি—কারণ মন্থ ও মননের জ্বালা জুড়োতে চাননি নির্বিশেষ নৈরাজ্যবাদের (nihilism) ভাব-গংগাতে। সুধীন্দ্রনাথ দেখেছেন মানব-সভ্যতার বিন্যাসগত অবক্ষয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার (technology) অভ্যুত্থানে মানুষ ধীরে ধীরে নিষ্প্রাণ যন্ত্র-ভগ্নাংশে (automaton) পরিণত হচ্ছে। আবার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করছে সর্বাত্মক রাষ্ট্র-তন্ত্র। যেখানে প্রজ্ঞার আলোকে দীপ্ত নয় মানুষের ব্যবহারিক বুদ্ধি, বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনা যখন প্রযুক্তি-বিদ্যার সবল মুঠিতে, সমকালীন মানুষের অস্তিত্ব সেখানে করুণ অসহায়তার ছবি। কিন্তু এই অবস্থার নৈতিক দায়িত্ব তো আমাদেরই। বর্তমানের মানুষে-গড়া দৈত্য সমকালীন মানুষকেই গ্রাস করতে উদ্যত। তার এই করুণ, অসহায় অবস্থার অন্তরংগ পরিচয় পাই সুধীন্দ্রনাথের কবিতায়। কিন্তু তাই বলে তাঁর কবিতা নেতিবাচক হয়ে ওঠেনি। কারণ মানুষের বুদ্ধি ও বোধি, প্রেম ও অনুভূতিতে কবি বিশ্বাস হারান নি।

আবার শ্রেয়বোধের সংগে সংঘর্ষ, সেইসংগে সুন্দর ও সত্যের প্রতি এক রকমের নির্মম ঔদাসীন্য আমাদের জীবনে সৃষ্টি করেছে মহাশূন্যতা আর রিক্ততার হাহাকার। সমকালীন মানুষের এই যন্ত্রণাকে কবি সুধীন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন, ব্যথিত হয়েছেন—

> কোথায় লুকবে? ধূ-ধূ করে মরুভূমি,
> ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া মরে গেছে পদতলে।
> আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই;
> নির্বাক, নীল, নির্মম মহাকাশ॥

সুধীন্দ্রনাথ তাই যেন "নির্মম যন্ত্রণার কবি।"

অস্ফুট সংলাপ

স্বাপ্নিক

লোকটা চুপচাপ বসে আছে। কি ভাবছে জানি না। দারিদ্র্য হয়ত মুখর মানুষটাকে মূক করে দিয়েছে। নীল আকাশের নীচে কেমন করে বেঁচে থাকবে, বিবর্ণ জীবনকে কি করে আবার ছন্দময় করে তুলবে—লোকটা বোধ হয় তাই ভাবছে। ধিক্কার দিচ্ছে ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর সভ্যতাকে—বিকৃত যান্ত্রিক শতাব্দীকে।

লোকটা একভাবে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। আমিও দেখছি বড় রাস্তার পাশে ভাঙা টিনের বাক্স আর পুঁটলি নিয়ে বসে আছে অনেকগুলো স্ত্রী-পুরুষ। রাস্তার ধুলোয় ময়লা কাঁথা-কাপড় বিছিয়ে শুইয়ে দিয়েছে শিশুকে। কেউ বা রান্না চড়িয়ে দিয়েছে তিনটে ইঁটের উপর। ধুলোবালি পড়েছে রান্নাকরা জিনিষে। তবু তাই খেতে হবে: অকালে ফুরিয়ে যাবে সোনালী জীবন।

সামনেই একটা চায়ের দোকানের বেড়ায় লাগানো রয়েছে লাল কালি দিয়ে বড় বড় করে লেখা দাবীর প্রচারপত্র।

"আমাদের দাবী মানতে হবে। মানুষের মত বাঁচবার অধিকার দিতে হবে। শ্রমিকশ্রেণী—জিন্দাবাদ।" ধর্মঘটীদের অন্তরের সকরুণ আর্ত্তি। লোকটা কি তাই দেখছে? ভাবছে এইসব মেহনতী জনতার কথা। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনির পরিণাম। বেঁচেও এরা মরে আছে। প্রতিবাদ করলে এরা গুলী খেয়ে মরে। নোংরাবস্তি, মাতলামি, আর অশ্লীল বুলি—অভিশপ্ত জীবনযাপন।

পার্কে হাওয়া খেতে যাচ্ছে একদল লোক ট্যাক্সি চড়ে, জীবনকে উপভোগ করতে আর গাড়ীর ধুলো এসে পড়ছে বাস্তহারার ক্ষুধার অন্নে, তৃষ্ণার পানীয়ে —গণদেবতার পূজার প্রসাদে।

লোকটা হয়ত শুনছে, পাশের চায়ের দোকানে কথার ঝড় উঠছে। রাশিয়া-আমেরিকার মুখরোচক সংবাদের সমালোচনা করছে আড্ডাবাজরা। আমেরিকার রণ-দুন্দুভি আর রাশিয়ার, লালচীনের সাম্যবাদ—ধনী-দরিদ্রে সমবণ্টন মায়াবাদের ললিতকথা আর ভারতের পঞ্চশীল সব কেমন জট পাকিয়ে

যাচ্ছে। যুদ্ধ এনেছে কালোবাজার, কালোবাজার এনেছে মন্বন্তর আর মন্বন্তর এনেছে মৃত্যু।

লোকটা বসে আছে। লোকটা হাসছে। বিদ্রূপের হাসি। পৃথিবীটা একদিনে ধ্বংস হয়ে যাক, পৃথিবীর লোভী মানুষগুলো একদিনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক, এই বোধ হয় ওর অন্তরের কামনা। ওর মনের গভীরে ঢুকতে পারছি না। অতীতদিনের স্মৃতিরা হয়ত সজীব দুঃস্বপ্নের মত উঁকি দিচ্ছে ওর মনে, ওকে করছে বিভ্রান্ত।

ভাল করে লোকটাকে লক্ষ্য করি। গায়ে ছেঁড়া তেলচিটে গেঞ্জী, পরণে রঙচটা লুংগি। চোখের মনি গর্ত্তে ঢোকা। সারামুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বয়সে এমন একটা বেশী কিছু নয়, অথচ মনে হচ্ছে ষাটবছরের একটা কংকালসার বুড়ো।

লোকটা পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করল। একগাল ধোঁয়া ছাড়ল। কপালের শিরাগুলো কুঁচকে গেল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

একটা সচলস্রোত যেন থমকে গেছে। ওর একদিন সব ছিল। আজ সবার উপেক্ষার পাত্র। পাকিস্থান ছেড়ে চলে আসা বাঙালী হিন্দুর মধ্যে ও হয়ত একজন।

একভাবে বসে এতক্ষণ লোকটা কি ভাবছে! কৌতূহল হচ্ছে। ওর সংগে আলাপ করতে হবে, শুনতে হবে ওর বোবামনের গান।

চিন্তার রাজ্যে হারিয়ে গেছি। আবার তাকাই লোকটা সেখানে বসে আছে সেদিকে। লোকটা চলে গেছে। লোকটা নেই। কোথায় গেল লোকটা। লোকটা কোথায়ও যায়নি। রাস্তার ধারের ছোট সংসারে সে আবার ফিরে এসেছে। ওর মনের অস্ফুট সংলাপ আমার কাছে স্পষ্ট আমার কাছে অতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

পানকৌড়ির দেশ থেকে ও পালিয়ে এসেছে ইঁটের রাজ্যে। পলি-মাটিতে পায়ের দাগ এঁকে ও তো আর ফিরে যাবে না শিশির-ভেজা পাকা ধানের বুকে।

শুনবে না আর বনঝাউয়ের গান!

ভ্রান্তি

শ্রীসুধীরকুমার মল্লিক

বাসাবাড়ী, তবে কোয়ার্টার্স নয়। ভূতপূর্ব দোকানঘর। এককালে কন্ট্রাক্টরের কাপড়ের দোকান ছিল।

সামনেই একটা এঁদো পুকুর। চার পাশটা জলজ উদ্ভিদ আর লতা পাতায় ভর্ত্তি। মাঝখানে শেওলা-পড়া এক ঝলক লাল জল। গোটা কয়েক বাঁশ ঝাড়, কলাঝাড় আর আগাছা জঙ্গলে আকীর্ণ ঘরের তিনটি দিক। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেমনা আর গোসাপ চমকে দিয়ে পালায় পায়ের কাছ দিয়ে। দিনের বেলায়ও বিনা মশারীতে ঘরে টেকা দুষ্কর। একটু বৃষ্টি হলেই একটা পচা তেপসা দুর্গন্ধে নিশ্বাস আটকে আসে, আর ভাঙ্গা টালির ফাঁক দিয়ে জল পড়ে ঘর বারান্দা একাকার হয়ে যায়। বাড়ীওয়ালা নির্বিকার। বেশ মোটা একটা ভাড়া দিয়ে এহেন বাড়ীতে আমার সপরিবার অধিষ্ঠান। চাকুরী করি।

এই অজ পাড়াগাঁয়েও দু'চারটে সরকারী চাকুরী থাকে আমাদের মত দু'চার জন ভাগ্যবানের জন্য। 'যেমন তেমন চাকুরী যি ভাত'— ছোট বেলায় কত যে শুনেছি এ কথা। বড় হয়ে চাকুরী করার লোভ বা উচ্চাকাঙ্খা তখন থেকেই বাসা বেঁধেছিল মনে। তা যি না হোক, ভাত দু'টো জুটছে বই কি! জল কাদা ঘেটে ঘেটে গ্রামে গ্রামে ঘুরি তবু গ্রামের চাষী ভাইরা 'বাবু' বলে সম্মান করে। দাওয়ায় বসিয়ে কখনো কখনো দু'চারটে সুখ দুঃখের কথা বলে। আসুন বাবু, সার— কবে পাওয়া যাবে জিজ্ঞাসা করে। তবে বিশ্বাস করে না। ওরা জানে বাবুদের তোষামোদ না করলে কিছু পাওয়া যাবে না। যে যত ভাল করে 'ধরতে' পারবে বাবুদেরকে, সে তত কাজ পাবে। ওদের ঐ খাতির যত্নটুকু 'ধরার' উদ্দেশ্যেই হয়ত। তবু যতক্ষণ ওদের মধ্যে থাকা যায় ভালই থাকি। এখনও ওরা মন আর মুখ ঠিক দু'রকম করে উঠতে পারে না চেষ্টা করেও। যা বলে যা করে তার মধ্যে আপনা আপনিই খানিকটা হৃদয়ের ছোঁয়া এসে লেগে যায়।

তবে একটা বিষয়ে শিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিতদের সংগে এই চাষী ভাইরাও একমত। আর সামনে 'বাবু' 'বাবু' করলেও ওদের দিকে পিছন ফেরার

সংগে সংগে সে কথা ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে। এরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না সরকার কেন মাসে মাসে এতগুলো টাকা দিয়ে আমাদের মত নিষ্কর্মাদের পুষছেন।

তা ওদের আর দোষ কি! ঘরের লোক গৃহিণী যে গৃহিণী তিনিও বুঝে উঠতে পারেন না কেন আমার মত অকর্মাকে সরকার মাইনে দিয়ে পোষেন। অবশ্য বুঝতে না পারার কারণও যে নেই তা নয়।

সমাজে বাস করতে হলে মানুষের সংগে মেলামেশা লৌকিকতা বাদ দেওয়া যায় না। পাশের বাড়ীর সুদর্শন বাবু স্থানীয় লোক। গাঁজা আফিমের দোকান আছে। ভাঁড়িরা সাধারণতঃ টাকা পয়সার বেলায় খুব সতর্ক। কিন্তু সুদর্শন বাবু এর ব্যতিক্রম। তিনি খুব মিশুক, বিশেষ করে থানার পুলিশ কনষ্টেবল দারোগা থেকে বাইরের প্রত্যেক বিভাগের অফিসারদের সংগে তাঁর খুবই দহরম মহরম। তাঁদের কাউকে না কাউকে প্রায়ই নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান। তাঁদের পরিবারের সংগে ঘনিষ্ঠ ভাবে উঠাবসা করেন। আমার বাসায় কয়েকদিন তিনি এলেন, এলেন তাঁর স্ত্রী। গৃহিণী চা খাইয়ে সামাজিকতা রক্ষা করেন। কিন্তু সামাজিকতার আর একটা দিক আছে—যিনি আসেন তাঁর বাড়ী যে যেতে হয়। পর পর পাঁচছয় দিন বলার পর গিন্নি গেলেন ছেলেমেয়ে নিয়ে একদিন বেড়াতে। সুদর্শনবাবু তাঁর স্বভাবসুলভ উদার আতিথ্য দেখিয়েছেন—লুচিমিষ্টি কিছু বাদ যায় নি। সে রাত্রে গিন্নি ফিরে আর কিছু খান নি। আমারও খাওয়া হয় নি। অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে।

আমি তাঁর বিরক্তি আর হতাশার কারণ বুঝি। তাই চাকে ডাকে তটস্থ হয়ে থাকি। তাঁর রণচণ্ডী মূর্তি দেখলে আস্তে আস্তে সরে পড়ি সামনে থেকে। তবে আজকাল মাঝে মাঝে ভড়কে যাই। যখন নিরুত্তাপ গলায় এমন এক একটা কথা বলেন। সেদিন গৃহিণী বললেন খুব শান্ত গলায়, তোমার চেয়ে যদি কোন অফিসের পিওনের হাতে পড়তাম, তা হলেও বোধ হয় এত অপমান ভোগ করতে হ'ত না।

একটু অবাক হয়ে সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি আবার অপমান করলাম কবে তোমায়?

গৃহিণী ম্লান হেসে বললেন, না, তুমি কেন অপমান করবে—অপমান করেছে আমার কপাল। তারপর এষ্টেশন অফিসের পিওন নন্দকিশোরের

গল্প বললেন, তারও পাঁচছটা ছেলেমেয়ে। আমার চেয়ে একটা ভাল ঘর নিয়ে আছে। রোজই প্রায় মাছমাংস দই মিষ্টি খাচ্ছে। আর মাঝে বাড়ীতে গেলে সে কি আদর আপ্যায়ন। কনষ্টেবল সুখলাল, গোবিন্দ এরাও কেমন সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। গোবিন্দর ছোট্ট বউটা কেমন সুন্দর সুন্দর কাপড় পরে। সুদর্শনবাবুদের সংগে এঁদের কি ভাব। ভেটেরী-নারী অফিসের কেরাণী শিবপদবাবুর বউএর কি ভাট। চব্বিশ ঘণ্টা তার বাসায় রেডিও চলছে। টেনে টেনে কথা বলে, আমাদের উনি আবার ডালডা খেতে পারেন না। বলেন, ডালডা আবার ভদ্রলোকে খায় নাকি! সেদিন যে কাপড়টা গৃহিণী পরে গিয়েছিলেন ওদের বাসায়, ঠিক সেই রকম একটা কাপড় নাকি আটপৌরে পরার জন্য ছিল তার। কথায় কথায় বললে, অত সস্তা কাপড় পরে বেরোনো নাকি তার অভ্যেস নেই।

অর্থাৎ 'পাঁচজনে পারে যাহা আমিও পারিব তাহা' গৃহিণীর এই ক্ষীণতম প্রত্যাশা আমি সফল করতে পারি নি। রাগ, অভিমান, অনুনয় বিনয় কিছুই কোন কাজে লাগে নি। অবশেষে চরম হতাশার বেদনায় পাথর হয়ে গেছেন। তাই আজকাল তাঁর কথায় তাপের চেয়ে ভারীত্ব বেশী থাকে,—তা দহন না করলেও পিষে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়।

পিওন নন্দকিশোরকে যে মাছমাংস কিনে খেতে হয় না, লোকে উপকারের বিনিময়ে স্বেচ্ছায় তা দিয়ে যায় গোপনে গোপনে, কিনতে হলেও মাসিক যে বাঁধা আয় পঞ্চাশ টাকা তাতে হাত পড়ে না। সুদর্শন বাবুর গাঁজা আফিমের দোকান বেলা চারটায় বন্ধ হলেও গভীর রাত্রি পর্যন্ত গোপনে লেনদেন চালাতে হয়, আর তার জন্য দই মিষ্টি খাইয়ে রাখতে হয় সুখলাল গোবিন্দ কনষ্টেবলদের, খাতির রাখতে হয় অফিসার বাবুদের সংগে, পান বিড়ি চা খাওয়াতে হয় কংগ্রেসী কর্তাদের। এ সব জটিল তত্ত্ব গৃহিণীকে বুঝিয়ে লাভ নেই। আর তা বুঝতে যাবেই বা কেন? সংসারে আর দশজন যেমন করে বাঁচে আমি যদি তেমন করে বাঁচতে না পারি সে দোষ কার? ছেলেমেয়েগুলো খেতে পাবেনা, পরতে পাবে না, আর আমি যুধিষ্ঠির সেজে বসে থাকব, ক'জন গৃহিণী তা মেনে নেবেন।

ডালডা নেই, আটা নেই, আর অত সকালে দোকানও খোলে নি। মুড়িও পাওয়া যাবে না। তাই কিছু না খেয়েই মফঃস্বলে বেরুতে হ'ল।

বন্যার্ত্তদের ডোল দিতে হবে। দেরী করে বেরুলে চলবে না। ফিরতেও সেদিন বেলা হয়ে গেল খুব। সাড়ে বারোটা বেজে গেল। প্রথম সম্ভাষণ হ'ল গৃহিণীর—

খেয়ে আজ অ-বেলা। সেদ্ধ করে রেখেছি। আড়াইসের তেল কত-দিন হবে আর। আমি বলে তাই আজ কুড়ি দিন করেছি।

মৃদু গলায় বললাম, তা ফুরিয়ে গেছে যখন, তখন বাবলুকে পাঠিয়ে দোকান থেকে আর পাঁচপোয়া তেল আনিয়ে নিলেই তো পারতে। আমার উপর রাগ করছ কেন?

গৃহিণী এবার খেঁকিয়ে উঠলেন, দোকানওয়ালারা তোমার বড়কুটুম কিনা যে বাদদশহরাতে তোমাকে ধার দেবে এখন। পাঠাতে কি 'না' করেছি? দেছে অপমান করে ফিরিয়ে।

একটু রুক্ষ হয়ে উঠলাম, তা তোমার জন্যেই তো এ অপমান হ'লো। তোমার ফরমাস মত ছেলেমেয়েদের জামাকাপড় কিনতে অতগুলো টাকা খরচা না করলে তো আর ভাবতে হ'ত না।

গৃহিণী আরও একটু চড়িয়ে দিলেন, বেশ করেছি। পূজোর সময় সকলের ছেলেমেয়ে নোতুন জামাকাপড় পরে বেড়াবে, আর আমার ছেলেমেয়ে ফকির সেজে থাকবে, তার চেয়ে বেঁচে না থাকাই ভাল। না খেয়ে থাকতে হয় সেও স্বীকার। বলতে বলতে ভেতরে গেলেন। গৃহিণীর ঝগড়া করার ঐ রীতি। মাঝে মাঝে ভঙ্গ দিয়ে নূতন শক্তি সঞ্চার করে আসেন।

ফিরে এসে আবার নব উদ্যমে শুরু করলেন, অপমানের আর হয়েছে কি? তোমার ছেলে হয়ে যখন জন্মেছে তখন কত অপমান সইতে হবে। এতো কেবল শুরু। অভ্যাস হোক এখন থেকে।

কি যে হ'ল আমার তা ঠিক বলতে পারি নে। সকালে উঠেই বেরিয়ে গেছি বন্যার্ত্তদের ডোল বিলি করতে। কিছু খেয়ে বেরনোর ভাগ্য হয় নি। বেলা বারটা পর্যন্ত সমানে বকাবকি, নানা ঝামেলা করে কেটেছে। তারপর ক্লান্ত ক্ষুধার্ত্তদেহ টেনে টেনে বাসায় না পৌঁছতেই এই পরিস্থিতি। গৃহিণীর বহু কটুক্তি তো এই এত বছর ধরে হজম করে আসছি। তবু আজ কি হল—মনটা যেন খুবই খারাপ হয়ে গেল। জামা কাপড় ছাড়তে যাচ্ছিলাম, না ছেড়েই বেরিয়ে পড়লাম আবার ধীরে ধীরে।

গৃহিণী দেখতে পেয়ে পিছু ডাকলেন, আবার চললে কোথায়। অ-বেলা অমৃতি গিলে আমাকে মুক্তি দিয়ে যাও।

গৃহিণীর ডাকে উত্তর দিবার প্রবৃত্তি হ'লো না। পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, ভাবলাম রাস্তার কল থেকে খেয়ে নেব।

ফিরলাম যখন তখন শরৎকালের বেলা গড়িয়ে পাঁচটা বেজে গেছে। সন্ধ্যার ছায়া নেবে আসবে এখনই। দেখি সামনেই গৃহিণী দাঁড়িয়ে। কটু গালির একটা ঝড় আসছে ভেবে সহ্য করার জন্য মনটাকে শক্ত করতে লাগলাম। কিন্তু আশ্চর্য, কাছে এসে পড়লাম, তবু গৃহিণী যেমন বারান্দার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়েছিলেন তেমনি রইলেন। মুখে একটা কথাও বললেন না। আমিও কিছু না বলে পকেট থেকে চারখানা দশটাকার নোট তুলে ওঁর হাতে গুঁজে দিলাম।

গৃহিণী আমার পানে গভীর দৃষ্টি মেলে চাইলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, এ টাকা কোথায় পেলে? আজ তো মাইনের দিন নয়।

আমি ম্লান হেসে বললাম, যোগাড় করে আনলাম।

গৃহিণী এবার তাঁর চোখের রঞ্জনরশ্মি ফেললেন আমার বুকে—আমার মুখ নীচু হয়ে গেল সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে।

শান্ত মৃদু গলায় বললেন, ঘুস নিয়েছ? ছিঃ! টাকাগুলো ওঁর হাত থেকে ছড়িয়ে পড়ল বারান্দায়।

তা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। জানোইতো পূর্ণিমা পর্যন্ত কেউ ধার দেবে না। তোমার ছেলেমেয়েদের অনাহার ও অপমান থেকে বাঁচানোর ঐ ছিল একমাত্র পথ।

গৃহিণী বললেন, আমার তো এখনও দু'একখানা গহনা অবশিষ্ট আছে। তারই একখানা আপাততঃ রেখেও তুমি চালাতে পারতে।

জীবনে এমন প্রস্তাব এই প্রথম। এর আকস্মিকতা ও অসম্ভাব্যতা আমাকে থ বানিয়ে দিলে। গৃহিণীর গহনার যে কি ধার তা এই দীর্ঘ পনেরো বছরের ঘরকন্নার হাড়ে হাড়ে বুঝতে বাকী নেই। কিন্তু সে কথা আজ স্মরণ করতেও সংকুচিত হলাম।

গৃহিণী ভেতরে গেলেন। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম তেমনি ঠায়। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর দেহ নিয়ে ছয় মাইল পথ হেঁটে গিয়েছি। নূতন মক্কেলকে এবার সার ও আলুর বীজের ডীলারসিপ দেব, ব্যবসায়েও তার

সুবিধা সুযোগ যাতে হয় তা দেখব কথা দিয়ে তবে সংগ্রহ করেছি এই টাকা। অবশ্য চেয়েছি ধার, তবে শোধ দিতে হবে না তা জানি, যে দিয়েছে সেও জানে।

সারাদিন কেটে গেছে। এখনও অস্নাত, অভুক্ত আছি। যেন দাঁড়াবারও আর শক্তি নাই। মনে হ'ল, কোথায় যেন বড় ভুল হয়ে যাচ্ছে আজ।

গৃহিণী ফিরে এলেন। তেল গামছা নিয়েই এলেন। রেখে দিয়ে বললেন, দেখি জামা খোল। এই করে বেড়াচ্ছ সারাদিন না খেয়ে না দেয়ে। আর ছেলেমেয়েগুলোও হয়েছে তেমনি। আমি যে এত করি আমার জন্ত তাদের একরত্তি দরদ নেই। আর তুমি খেয়ে গেলে না বলে একটাকেও যদি আমি খাওয়াতে পারলাম! সেই কোন সকালে দু'টো মুড়ি খেয়েছে।

এরা আজ সবাই সারাদিন উপোষ করে আছে তাহলে! লজ্জায় মরে গেলাম যেন। তাড়াতাড়ি গামছাটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

পূর্ণাহুতি

শংকু লাহিড়ী

পনের দিন পরে যখন হাসপাতাল থেকে ফিরে এল তখনও দেহের দুর্বলতা কাটেনি মানসীর। মাত্র কয়েকটা দিনেই এক প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেল, তছনছ করে দিল ওর সারা জীবনটাকে।

কালো অন্ধকার আকাশের বুকচিরে হঠাৎ একদিন আগুন জ্বলে উঠল চারিদিকে। একটা বীভৎস অমানুষিক চীৎকার আর ভয়ার্ত্ত মানুষের আর্ত্তনাদে মুখর হয়ে উঠেছিল দিগন্ত। ঘুম-জাগা চোখে ভয়ের কালো ছায়া নেমেছিল ওর। বাবা, মা, ভাই বোনদের মুখেও দেখতে পেয়েছিল শংকাতুর ভয়ের ছায়া। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এসেছিল রক্তপায়ী তৃষ্ণার্ত্ত নর পশুর দল। ভাষার জন্ত নয়, আদিম পৈশাচিক কামনা বুকে নিয়ে। পাশবিকতা চরিতার্থতা করতে।

টার্চ, বন্দুক, বর্শা, লাঠি, আর মশাল জ্বালিয়ে অন্ধকারের সংগে মিশে একেবারে এক হয়ে প্রেতের মত শরীর নিয়ে কতকগুলো জান্তব প্রেত এগিয়ে এসে মুখে কাপড় বেঁধে নিয়ে গেল মানসীকে।

বেঁচে যে আবার কোনদিন ফিরে আসবে এ কথা কি মানসীই ভাবতে পেরেছিল। বেঁচে শুয়ে শুয়ে কতদিন ভেবেছে বাবা, মা, ভাইবোনদের কথা। বেঁচে আছে কি তারা? হয়তো আছে, হয়তো নেই! তবু আশায় বুক বেঁধেছিল মানসী। মানসীকে আর ছোড়দাকে বাদ দিয়ে ওদের সংসার হয়তো আবার গড়ে উঠেছে নতুন করে। ঝড়ো পাখীর ডানায় আবার দেখা দিয়েছে তৈলাক্তের আভাস। ছোড়দার কথা ভাবতে গিয়ে বার বার শিউরে উঠছে মানসী। তাড়াতাড়ি চোখ বুজে ফেলেছে আবার সেই হিংস্র দৃশ্যটা দেখার ভয়ে।

কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন, পুলিশের ঘাটিতে ঘাটিতে খবর দেওয়ার নিশ্চিন্ত পরিণতির পর্ব্বটা শেষ হল। পনের দিন পরে পুলিশের ভ্যানটা মানসীকে নামিয়ে দিয়ে গেল ওদের বাড়ীতে।

ছোট বোন উষসীই প্রথম দেখল। বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রশ্ন করে—"দিদি তুই বেঁচে আছিস্"! পরম মমতায় উষসীকে জড়িয়ে ধরে—"মা কোথায় রে? বাবা? খোকা?"

—"খোকা তো বেঁচে নেই, মা রান্নাঘরে, বাবা কাজে বেরিয়েছেন।" এক নিশ্বাসে উত্তরগুলি দিয়ে ঝড়ের বেগে বেড়িয়ে যায় উষসী, আনন্দে চীৎকার করতে করতে।

মাকে প্রণাম করে পরে ধীরে সুস্থে সব কথাই শোনে মানসী। দাদার কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারে না। নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যে বেঁচে আছে, মায়ের মনে সেই বিশ্বাসে আঘাত দিতে পারে না মানসী। শুধু 'জানিনা' বলেই ছোড়দার প্রসংগটা এড়িয়ে যায়।

এক মফঃস্বল শহরে চাকরী করতেন মানসীর বাবা। বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই কাটছিল সোনালী দিনগুলো, কোনদিন ভাবেইনি যে বাংলা ভাষায় কথা বলার অপরাধে তাদের স্বপ্নময় দিনগুলো বুদ্‌বুদের মত মিলিয়ে যাবে।

বিভিন্ন জায়গার অত্যাচারের খবর আগেই শুনতে পেয়েছিল ওরা। পালিয়ে আসবার ইচ্ছা থাকলেও প্রতিবেশীদের আশ্বাসে থেকে যেতে হয়েছিল ওদের।

তারপর হঠাৎই একদিন আগুনের লেলিহান শিখা জ্বলে উঠেছিল ওদের পাড়ায়। একটা অমানুষিক চীৎকারে আর কাতর আর্ত্তনাদে বীভৎস হয়ে উঠেছিল আকাশ বাতাস। আদিম বর্ব্বরতার নারকীয় অভিনয় হয়ে চলেছে একটার পর একটা। মানসী অবশ্য এখন বোঝে—তারা নয় ওটা একটা অজুহাত মাত্র। সভ্যতার পিঞ্জর ভেঙ্গে যে হিংস্র লোলুপ রূপটা মানুষের বেরিয়ে পড়েছে তারই একটা বাহ্যিক মুখোশ।

ভয়ে, আশঙ্কায়, নির্ব্বাক হয়ে পড়েছিল সকলে। ঘুম জড়ানো চোখে উঠে বসেছে সকলে। সবারই মুখে তখন একটা থম থমে ভাব, এক আসন্ন ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষন।

তারপর সেই অভিশপ্ত সময়টাও এগিয়ে আসে ধীরে ধীরে, একদল হিংস্র নর পশু জোর করে ধরে নিয়ে যায় মানসীকে। ওদের ভয়ংকর চেহারার দিকে চেয়ে ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল মানসী। কতক্ষণ এই ভাবে কেটেছে মনে নেই। একটা পরিচিত চীৎকার সম্বিৎ ফিরে পায় মানসী। দেখে ছোড়দা আকুল হয়ে চীৎকার করছে—"ওকে ছেড়ে দাও, ওকে তোমরা নিয়ে যেওনা।"

সে কান্না ওদের কানে পৌছায়নি। পাশবিক হল্লার তলায় পড়ে গিয়েছে সে কান্না। ছোড়দাকে ধরে খণ্ড খণ্ড করে কেটেছে টাঙ্গি আর কুড়ুল দিয়ে, তারপর নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছে ছোড়দার খণ্ডিত দেহটা। রক্তে লাল হয়ে উঠেছে নদীর জল। সর্ব্ব পাপহারী নদীরও লজ্জার রক্তিম প্রকাশ। সে ভয়াবহ হিংস্র দৃশ্য দেখতে পারেনি মানসী। সংগে সংগে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল মাটিতে।

তিনদিন পরে যখন জ্ঞান হল তখন দেখে হাসপাতালেরই একটা বেডে শুয়ে আছে মানসী। সমস্ত দেহে অসহ্য যন্ত্রনা। শরীর ভীষণ দুর্ব্বল।

মানসীকে ধরে নিয়ে যাবার পর ওর ছোড়দা সংগে সংগে বেরিয়ে যায় মানসীকে ফিরিয়ে আনার জন্য। এ সব ঘটনা তো পরে মায়ের কাছে শোনা। কিছুক্ষন পরেই আগুন লাগে ওদের বাড়ীতে। প্রাণভয়ে তখন সবাই পালাতে ব্যস্ত। কোলের তিনমাসের ভাইটার কথা যখন মনে পড়লো তখন বাড়ীর চিহ্ন মাত্র নেই। একটা ভস্ম স্তূপ অতীতের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাশের বাড়ীর প্রতিবেশীর সাহায্যে কোন রকমে প্রাণে বেঁচে পালিয়ে এসেছে সকলে।

একটা একটা করে কেটেছে চার পাঁচটা মাস। সাংসারিক আঘাতের ক্ষতও শুকিয়ে এসেছে ধীরে ধীরে। অত্যাচারের ফল ধরতে শুরু করেছে মানসীর দেহের অণুতে অণুতে। শিরায় শিরায় অনুভব করছে একটা অনস্বাদিতপূর্ব্ব চাঞ্চল্য। ঘৃণায় রি রি করে উঠছে ওর সর্ব্ব দেহ। নারী জীবনের পরম আশীর্ব্বাদ ওর জীবনে দেখা দিয়েছে চরম অভিশাপ রূপে।

রাত্রে জল খেতে উঠে তার পরিচয় পেল। মা বাবাকে বলছেন—"এর একটা ব্যবস্থা কর। পাড়ায় যে আর মুখ দেখান যায় না। পরে যে মাহুর বিয়ে দেওয়া মুস্কিল হয়ে উঠবে। তুমিতো মেয়ে মানুষ, ভাল করেই বোঝ কি হয়েছে মানসীর।"

আর শুনতে পারেনি মানসী। কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে ওর সারা দেহটা। রুদ্ধ অভিমানের জলে ভাসিয়ে দিয়েছে সমস্ত বালিশটা।

কাকে সে তিল তিল করে রক্ত দিয়ে পুষ্ট করছে? যারা ওর জীবনকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে তছনছ করে দিয়ে গেল, ছোড়দাকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করল। তার ভাষাকে স্বীকৃতি দিল না, অথচ তার দেহটা পূর্ণ ভাবে ভোগ করল,সেই কুৎসিত নর পশুদের উত্তর পুরুষকে? সারা জীবন এ কলংকের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে, একটা ঘৃণিত ইতিহাসের স্বাক্ষর হয়ে বেঁচে থাকবে?

ধীরে ধীরে উঠে বসে মানসী। মন স্থির করে ফেলে। তারপর বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। পরনের শাড়ীটা পাকিয়ে রান্না ঘরের বাঁশের আড়ার সংগে একটা মুখ বেশ শক্ত করে বাঁধে, আর একটা মুখও জড়িয়ে দেয় নিজের গলার সংগে। তারপর..... ঘুমন্ত মহাকালের বুকে মহাকালীকে আহ্বান জানানোর জন্ত শেষ বারের মত 'মা' বলতে গিয়ে চিরকালের জন্ত থেমে গেল।

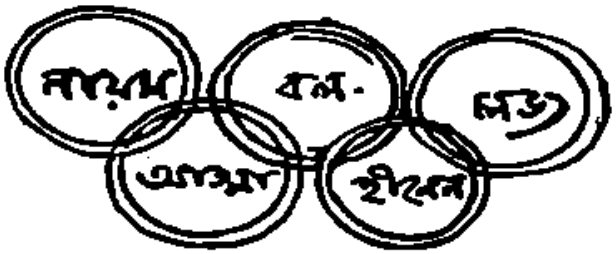

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—"গীতা পাঠ ছেড়ে ফুটবল খেল…"। ভারতের যুবসম্প্রদায় 'গীতা' ছেড়েছিল অনেকদিন কিন্তু ফুটবলও ধরলো না। শুধু সুবিধার জন্য স্বামীজীর কথা ব্যবহার করে বেড়াতে লাগলো। বলিষ্ঠ হবার জন্য স্বামীজির আহ্বান যে কার্যকরী করার চেষ্টা হচ্ছে না, তা বোঝা গেল "রোম অলিম্পিকস্" প্রতিযোগিতায়।

এবারকার অলিম্পিকে মোট ৮৩টি যোগ দিয়েছিল—যা ইতিপূর্বে কোন অলিম্পিকে হয়নি। কিন্তু খেলা শেষে এবারও আমরা দেখলাম রাশিয়া ও আমেরিকা যথারীতি প্রাধান্য অর্জন করেছেন। খেলা যেন এ দুটি দেশেই সীমাবদ্ধ। কত স্বচ্ছন্দ ওদের চালচলন আর সাবলীলতা!

তাই বা কেন—ইটালী, জার্মানীই বা কি কম করেছে! আর পাকিস্থান—ক্রীড়াজগতে একদা অপরিচিত ও অবজ্ঞাত এই দেশটি আজ ভারতের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে হকির স্বর্ণপদক—তার নিরঙ্কুশ আধিপত্য। এ ছাড়াও তারা পেয়েছে আরও একটি ব্রোঞ্জ পদক। কারণ তাদের আছে উদ্যম, আছে বড় হবার অদম্য আকাঙ্খা।

ভারতের ঠিক সেইখানেই গলদ। গতানুগতিকতার ধারায় গা এলিয়ে দিলে এমনটিই হয়। চাই অনুশীলন।

অনেক কিছু বিষয়ই তো কৃতী ভারতীয় অ্যাথলেটদের দেখলাম—তবু তাদের চিরবাঞ্ছিত একটিমাত্র বিষয়েও জুটল লঘুতর সম্মান—একটা রৌপ্যপদক

আগামীর ভারত—ভবিষ্যতের ভারত, সেখানে চাই আলোর স্পর্শ—মানসিক এবং শারীরিক উভয়তঃ। সামনের অলিম্পিকে তাদের মান উন্নত হোক।

রোম অলিম্পিকে স্বর্ণপদকের হিসাবে রাশিয়া পেয়েছে ৪০টি, আমেরিকা ৩৩, ইতালী ১৩, জার্মানী ১০, তুরস্ক ৭, অষ্ট্রেলিয়া ৮, হাঙ্গেরী ৬, পোল্যাণ্ড ৪, চেকোশ্লোভাকিয়া ৩, রুমানিয়া ৩, ব্রিটেন ২, ডেনমার্ক ২, নিউজিল্যাণ্ড ২, জাপান ৩ ও বুলগেরিয়া, সুইডেন, অষ্ট্রীয়া, পাকিস্থান, নরওয়ে, গ্রীস এবং ফিনল্যাণ্ড একটি করে।

—দেবাশিস বাগচী

মহাচিত্রকথা

"...আকার যাই হোক, তাকে একটা গভীরতর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বদাই ব্যবহার করা যেতে পারে।...ভাগবত উদ্দেশ্যে, সেবায় নিযুক্ত হতে পারে না এমন কিছুই নেই।" শ্রীমার এ উক্তির পর এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথার ("...ওতে লোক শিক্ষা হয়...") পরে নাটক ও চলচ্চিত্রকে দিব্য-জীবন বা আধ্যাত্ম জীবনের সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করা যায় না একথা ভাবা চলে না। সঙ্গীত, নাটক, চলচ্চিত্র ও ভাগবত সাধনার সহায়ক-মাধ্যম হতে পারে। কিন্তু ঐ যে কথা—'হতে পারে' কিন্তু হয় কটা?

পাঁচালী পাঠ, কথকতা, যাত্রা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাচীনকালে ও কিছুকাল আগেও আমাদের দেশে চিত্তবিনোদন ও লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা হতো। যাত্রার প্রভাব এখনও পল্লীগ্রামে যথেষ্ট। আর্ট সেখানে অজ্ঞাতসারে মহৎকার্যে নিয়োজিত। কিন্তু শহরে আর্ট বড় ভয়ানক হয়ে উঠেছে এবং তার ছোঁয়া লেগে পল্লীর আলো হাওয়াও সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ আছে তা বলা যায় না। চলচ্চিত্রের বিচিত্র রোমাঞ্চ কদর্যকাহিনী কুশিক্ষা ও কুভাবের প্রভাব বিস্তার করছে। এবং এ হয়ে উঠেছে সংক্রামক রোগের মত।

প্রতিকারের উপায় হিসাবে গভীরভাবে সব জিনিষটা ভেবে দেখা দরকার। অপরিণত বয়স্কদের চিত্তবিকার, বিকারগ্রস্থ বয়স্কদের চিত্তবিনোদন এই যেন বেশীর ভাগ মঞ্চ ও চিত্রের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জীবনের সঙ্গে যুক্ত রাখতে গিয়ে অতি বাস্তবতায় দোহাই দিয়ে এ জীবন থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে অন্ততঃ জীবনে প্রয়োগ করার মত কোন পরিকল্পনা দিচ্ছে না। প্রেমের কাহিনী বলুন, ভগবান-কথা বলুন, আদর্শ বলুন এমন ভাবে ছায়াচিত্র ও মঞ্চে রূপায়িত হচ্ছে যা না দিতে পারছে আনন্দ, না দিতে পারছে সুস্থতা বোধ। মাঝে মাঝে মনে হয় এ সবের চেয়ে আগের দিনের যাত্রা কথকতা ছিল ভাল। একটা কর্মক্লান্ত লোক দিনের শেষে এসবের মধ্যে পেতো মনের মত কিছু; আনন্দ পেতো এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবনে প্রয়োগ করার মতও পেতো অনেক কিছু। এখনকার সময়ে বেশী সিনেমা-থিয়েটার-দেখা ছেলে অসামাজিক বখাটে বা বয়স্ক অসামাজিক বখাটে লোক বেশী সিনেমা থিয়েটারে মত্ত। আর যারা এ সব শিল্পের সঙ্গে যুক্ত আছে তাদের তো কথাই নেই। তারা যেন

সমাজ বহির্ভূত অতি মানবীয় কিছু। অথবা সুকুমার রায়ের ভাষায় অধমর্ণেরা, "কনিষ্ঠটি তবলা বাজায় যাত্রাদলে পাঁচ টাকা পায়।"...উত্তমর্ণেরা তো ধরাকে সরা জ্ঞানে অজ্ঞান।

আসলে বিষয়টা নূতন করে ভাবতে হবে এবং সব কিছু নূতন করে ঢেলে সাজাতে হবে। চলচ্চিত্র বা মঞ্চ যাই হোক সবই মহৎ কর্মে সাহায্য করতে পারে এমন ব্যবস্থা করতে হবে। যারা প্রযোজক যারা অভিনেতা যারা কর্মী —সবারই অন্ত ধরণের প্রস্তুতি নিয়ে তবে এ পথে আসতে হবে। ভগবৎ ভক্তি বোধ বা আধ্যাত্মিকতা সকলের পক্ষে অবশ্যস্তাবী না হলেও সাধারণ সমাজ বোধ,নীতিবোধ এসব আগে একান্তভাবে থাকা দরকার। অবশ্য এ ব্যাপারে দর্শক ও সরকারেরও বিশেষ সতর্কতা থাকা প্রয়োজন।

ভাল ছবি ও ভাল নাটক যে হয় না তা বলা যায় না। কিন্তু সে সব 'হঠাৎ'-এর কাণ্ড। শুধু চিত্ত বিনোদন ও সেই সুযোগে অর্থ আত্মসাৎ করার বৃত্তি দূর না হওয়া পর্যন্ত এ কল্পিত ক্রান্তি সম্ভব নয়। দর্শকেরা যেন অভিনেতা বা প্রযোজকদের কাছে শিকার মাত্র।

বাংলার ছবির মধ্যে কিছু আদর্শনানুগ বক্তব্য থাকলেও তা জীবনের স্পর্শ করে না বা তাতে জীবন কিছু সজীবতা পায় না। বার্ণার্ড শ'য়ের কথায় মঞ্চ যদি আধুনিক কালে দেবালয় বিশেষ, তাহলে বলতে হয়, এখন এখন তা অপদেবতালয় হয়ে উঠেছে। একদা মুকুন্দ দাসের যাত্রা, বেলগাছিয়ার নাট্যশালা বাংলায় যে জীবনের জয়গান করেছে তা সম্প্রতি কোন মঞ্চ সাধিত করতে পারছে না। নিয়ন আলো আর বিজ্ঞাপনের যত চোখ ধাঁধানো ব্যবস্থাই থাক আখেরে সেই শূন্যতাই থেকে যাচ্ছে। টেক্‌নিক যদি মূল বক্তব্যকে ছাপিয়ে যায় তাহলে মূল বক্তব্য তো বিকৃত হয়ই, টেক্‌নিকের মূল উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হয়ে যায়।

সমস্যা দেখা দিয়েছে এই জন্যে যে, চিত্র ও মঞ্চ জগতের যারা মাথা, তাঁদের মাথায় 'আর্ট' সম্পর্কে ধারণা ইউরোপীয় ধারায় বিকৃত ভাব ঢুকে রয়েছে। 'না পারলি ইংরাজী শিখতে আর মাতৃভাষাটাও ভুললি'—এই রকম দশা হয়েছে এদের। কিন্তু এরা তা মানেন তো নাই বরং যুগ প্রবর্তক বলে দেয়াল লিপি মারতেও কুণ্ঠিত হন না। মঞ্চ ও চলচ্চিত্রে ক্রান্তি ঘটাতে হলে শক্তিশালী 'দর্শক-সমিতি' গঠন করে চাপা দিতে হবে, তবে যদি কিছু হয়। কারণ সরকারী সেন্সার বোর্ড এদের চেয়েও আর এক ডিগ্রি উপরে। সম্প্রতি

বাংলা চিত্রের সম্মান লাভ আরও ব্যাপক ও সুদৃঢ় হয়ে উঠতে পারে আদর্শবাদী কাহিনীকার পরিচালক প্রযোজক ও অভিনেতা অভিনেত্রীদের সংযোজনায়। চিত্ত বিনোদনের সঙ্গে নিত্যবোধের যোগ, নিত্যবোধের সঙ্গে সমাজ-জীবন ও ব্যক্তি-জীবনের সাযুজ্য—এসব প্রতিফলিত করার দায়িত্ব পালন করার শক্তি নিয়ে তাদের এগিয়ে আসতে হবে। আর তারজন্য জাগ্রত গণচেতনা দরকার এবং দরকার বোধে 'দর্শক-সমিতি' গঠন করার প্রস্তাব অবাস্তব নয়। (অভিমন্যু)

• উপরোক্ত নিবন্ধ সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকাদের মতামত আহ্বান করি।
—সঃ 'জাগরী'

যুগোত্তরণের অমোঘ বিধানে শাশ্বত চৈতন্যের নির্বিকল্প প্রচ্ছটা নবজীবনের শিল্প-সাহিত্যের বনিয়াদ। স্বর্ণযুগের অকুতোভয় বন্দনা গাইবার শক্তি সঞ্চয় আজ বড় প্রয়োজন! 'শিল্প দিব্যজীবনের জন্য'—Art for the sake of Divine Life'···এ আদর্শে গঠিত জাগরী লেখক-চক্র। এ আদর্শে বিশ্বাসী যে কেউ এর সভ্য-সভ্যা হয়ে সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক বৈঠকে যোগদান করতে পারেন...। রচনাদি পাঠ এবং পঠিত রচনাদির গঠন মূলক সমালোচনা করতে পারেন। ভর্তি ফিঃ ৫০ নঃ পঃ এবং মাসিক চাঁদা ২৫ নঃ পঃ। অন্য জ্ঞাতব্য থাকলে জবাবি কার্ডে যোগাযোগ করতে হবে। সম্পাদক, 'জাগরী লেখক-চক্র'

'দিব্যজীবনের সাধনা···শাশ্বত যৌবনেরই সাধনা'। মিথ্যা, প্রমাদ, মৃত্যু অজ্ঞানতা পূর্ণ পৃথিবীর রূপান্তরিত অমোঘ সম্ভাবনার দিশারী শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার আদর্শে দেশব্যাপী যুব-সংগঠন করা চলেছে। ৩১ বৎসরের অনূর্দ্ধ যে কেউ ২৫ নঃ পঃ প্রাথমিক বার্ষিক চাঁদা দিয়ে 'যুব-সম্মেলনের' সভ্য-সভ্যা হতে পারেন। বিস্তৃত খবর 'জাগরী'র ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। মেয়ে ও মহিলাদের জন্য 'নারী-তীর্থ' ও কচি-কাঁচাদের জন্য 'সবুজ-তীর্থ' সংগঠিত হয়েছে।

সুকুমার রায়

ছড়া

মৌমাছি

বাঁশ বনের টিয়ে
টোপর মাথায় দিয়ে
গড় গড় গামুক গাড়ি
হেই ওধারে শ্বশুর-বাড়ি
শ্বশুড় বাড়ি ত্যালডাঙা
টিয়ের কানে মাছরাঙা।

টিকেটুলির টিকটিকি
ছেড় হাত দাড়ি তিন হাত টিকি।
টিকিতে বাঁধা সিক্কে-টাকা
সারা গায়ে টিকিট আঁকা।

নেংটি মামী, ধেড়ে মামা
মামা-মামীর গায়ে জামা ;
জামে ভরা মাথার ধামা
ধামার গাইছে ধমক থামা।

স্বাধীনতা দিবসে

স্বপনবুড়ো

এই স্বাধীনতা আমরা চাইনি
যেথায় নাইরে প্রাণ,
এ মহাভারত ভুলিয়া কি গেল
মিলনের মহাগান !
যেথায় বাজে না একতার বাঁশী
জনতার মুখে নাহি যে রে হাসি—
একে অন্যের রুধির পিপাসু
বলে, "ওর প্রাণ হান !"
এই স্বাধীনতা আমরা চাইনি
যেথায় নাহিরে প্রাণ ॥

এই স্বাধীনতা আমরা চাইনি—
ভাই যেথা ভাই মারে
ভারত জননী নীরবে কাঁদিছে
কে মুছাবে আঁখি—হারে !
কোথায় বাপুজী, কোথায় গো নেতাজী
মিলন-মন্ত্রে দাঁড়াও না আজি
কপট-শাসন শিয়রে রয়েছে
নাহিরে পরিত্রাণ !
এই স্বাধীনতা আমরা চাইনি
যেথায় নাহিরে প্রাণ ॥

১৫ই আগষ্ট, ১৯৬০

॥ একটি মূল্যবান ঘোষণা ॥

'তারাপদ স্মৃতি' প্রতিযোগিতায় তোমাদের (সবুজ-তীর্থের সভ্য/সভ্যা) কাছ থেকে যে ৫০০ শব্দ শব্দের মধ্যে (তোমার জীবনের একটি উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা) যে রচনা আহ্বান করা হয়েছিল তার সময়ের মেয়াদ আরও বাড়িয়ে দেওয়া হল আগামী ১৩৬৭ সালের ১৫ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত। যারা আজও লেখা পাঠাওনি তারা সত্বর নিম্ন ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও।

মদন চৌধুরী
পরিচালক : সবুজ-তীর্থ
আরামবাগ : হুগলী

বিবেকানন্দ স্মরণে

তরুণকুমার দত্ত

কত দিন ভেসে গেছে কাল স্রোতে হায়,
তবু তো মানুষ আজও ভোলেনি তোমায়।
তোমার অমৃত বাণী দিকে দিকে জানি,
ভয়ার্ত্ত বসুধা বক্ষে আলো দেয় আনি।
লক্ষ লক্ষ সর্ব্বত্যাগী দীক্ষিত সন্তান,
জীবে দয়া করি' তোমা করেছে মহান॥

ভোরবেলা

অপূর্ব্বকুমার চট্টোপাধ্যায়

রাতের আঁধার পালিয়ে গেল এবার হ'ল ভোর—
খোকাখুকু ওঠো এখন দাওনা খুলে দোর।

*

রবিমামা পুব আকাশে দিচ্ছে যে ঐ উঁকি
খোকা এবার বগলো উঠে উঠলো নাতো খুকি।

*

তারার রাশি নিচ্ছে বিদায় আকাশের বুক থেকে
চাঁদের হাসি হারিয়ে গেল উষার আলো মেখে।

শরৎকাল

কুমারী শিপ্রা ঘোষ

লাগিল আজি কাশের বনে নবীন সুখের দোলা
আনন্দময়ীর আগমনে দুয়ার মোদের খোলা।
শরতের চিঠি পাই নীল আকাশের পারে
দিগাঙ্গনা হাতছানি দেয় ভরা নদীর ধারে।
চারি দিকে সমারোহে এই আয়োজন
জীবনের তুলিঘাতে হয় মায়ের বোধন।
হাওয়ার হিল্লোল তোলে সোনাগুচ্ছ ধানে
বাংলার ঘুমভাঙে চিরন্তনী শক্তির আহ্বানে॥

সেবা

হরিপ্রসাদ মেহ্দা

লঙ্কা অনেক দূর। মাঝখানে দুরন্ত সাগর। সীতাকে রাবণের কবল থেকে উদ্ধার করার জন্যে সেতু বন্ধন হচ্ছে। রাম, লক্ষ্মণ দাঁড়িয়ে সেতু তৈরীর কাজ দেখছেন। নল, নীল ও আর সব ইঞ্জিনিয়ারের দল তত্ত্বাবধান করছেন। অন্যান্য বানরেরা ব্যস্ত নিজেদের কাজে। বড় বড় পাথরের চাঁড়া ফেলা হচ্ছে সমুদ্রের বুকে। গাছ-পালা, জঙ্গল, মাটি, কিনারের যত কিছু আবর্জ্জনা সব দিয়ে ভরানো হচ্ছে সাগরের গভীরতা। ভগবানের সেবায় সকলেই যেন তাদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে।

ছোট একটা কাঠ বিড়ালী—তারও কি অভাবনীয় ব্যস্ততা। কারও দিকে তাকানোর তার অবকাশ নেই। কোথা থেকে মুখে করে যত রাজ্যের কুটো এনে একটী একটী করে ফেলছে স্রোতের মুখে। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই; একটানা সে কাজ করে চলেছে। তার সাহায্যে কতটুকু সেতু তৈরী হল তা ভগবানই জানেন। ভগবান রামচন্দ্র তাই হাসছিলেন, আর অসীম আগ্রহে তার কাজ পর্যাবেক্ষণ করছিলেন। এক সময় স্নেহের সম্বোধনে ডাকলেন তাকে—পাশে বসিয়ে আদর করলেন, গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। সেই হাতের আঙ্গুলের ছাপ আমরা তাই কাঠ বিড়ালীর পিঠের উপর দেখতে পাই। যা আজও ভগবানের মহিমা প্রকাশ করে চলেছে।

এদিকে ভগবান রামচন্দ্রের এ পক্ষপাতিত্বে ক্ষুব্ধ হল বানরের দল। "এ কি ধরণের বিচার! প্রাণান্ত পরিশ্রম করেও তারা আদর পেলনা, আর সামান্য একটা কাঠ বিড়ালী কিনা"—অভিমানে বানরকুল কাজ বন্ধ করে নিবেদন করতে চলল ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কাছে।

অন্তর্যামী তাদের অন্তরের কথা বুঝতে পারলেন। হেসে বললেন,—"তোমরা আমার আপনজন। সুখে দুঃখে আমার জন্যে জীবন তুচ্ছ করে সব কিছু করে চলেছ। তোমাদের জন্য তো সর্ব্বদাই আমি মঙ্গল কামনা করে থাকি। তোমাদের শক্তি আছে, সাহস আছে, বিপদে তোমরা ভয় পাওনা। কিন্তু সামান্য ঐ কাঠবিড়ালী ওর সেবায় হয়ত আমাদের সেতু বন্ধনের কোন কাজই হচ্ছেনা, তবুও ওর ঐ সামান্যতম দান টুকু, ওর ঐ গভীর আত্মবিশ্বাস আমি কেমন করে অস্বীকার করব। পরের জন্য যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে, সে যত ক্ষুদ্রই হোক, যত তুচ্ছই হোক তার দান,—তবু সে আদরের পাত্র, সকলের বরণীয়।"

প্রভুর উপদেশ শুনে নিজেদের মূর্খামীর কথা বুঝতে পেরে বানরকুলের মুখ লজ্জায় নিচের দিকে নেমে গেল। আর অন্যদিকে কাঠ বিড়ালী লেজ দোলাতে লাগল মনের আনন্দে, আপন তোলা সেবার কথা ভেবে।

সর্ব রুচি সম্মত নিখুঁত অলঙ্করণে

লক্ষ্মী জুয়েলারী হাউস

স্বর্ণশিল্পী ও মনিকার

২০৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট • কলিকাতা-১২

একদা গণপতি

একদা মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত রচনা করিয়া ইহাকে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য একজন লেখকের খোঁজ করিতেছিলেন। কিন্তু কেহই এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হইলেন না। অবশেষে পার্বতী-তনয় গণেশ এই শর্তে রাজি হইলেন যে তাঁর লেখনী মুহূর্তের জন্যও থামিবে না।

আধুনিক যুগের লেখকরাও চান যে তাঁদের লেখার গতি কোনক্রমেই ব্যাহত না হয়। আর এই অব্যাহত গতির জন্যই সুলেখা আজ এত জনপ্রিয়।

সুলেখা ওয়ার্কস্ লিঃ

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

জনপ্রিয়তায় শ্রেষ্ঠ

কারণ

গুণে অতুলনীয়

সুস্বাদু বিশুদ্ধ ও
স্বাস্থ্যপ্রদ

লিলি বিস্কুট কোং (প্রাইভেট) লিঃ, কলিকাতা-৪ ।